KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : নীড় প্রকাশন
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৪/১ ৫৪/২ ৫৪/৩ ৫৪/৪	Year of Publication : বর্ষা ১৪০০ শারদ ১৪০০ ফাল্গুন ১৪০০ চৈত্র ১৪০০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ২ শরৎ ১৪০০

জঙ্গী হিন্দু জাতীয়তাবাদ নয়, নম্র একটি জাতীয়তাবোধের প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্তে আমাদের জীবনে কতখানি ? প্রশ্নটি নিয়ে গৌরী আইয়ুবের অনুসন্ধানী আলোচনা।

শিকাগো ধর্ম মহাসভার শতবর্ষে ' সৈনিক সন্ন্যাসী ' ' বহুমাত্রিক মানুষ ' বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার মূল্যায়ন প্রয়াসে প্রবীণ চিন্তাবিদ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দীর্ঘ প্রবন্ধ।

বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধর্মোন্মত্ততার বিরুদ্ধেও যে আবেদন ছিল সেদিকে আলোকপাতকারী একটি আলোচনা।

তৃতীয় বিজ্ঞান এনেছে যে নতুনতর বিশ্ববোধ, বাংলা কবিতায় তার স্থান নিয়ে বিশিষ্ট কবির সন্দর্ভ।

ইট তৈরির মত কাজে সুফলা মৃত্তিকার বিপর্যয় সাধন নিয়ে ' মাটি '-র শেষ কিস্তির আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জার্মেনি বৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছেন ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

সায়েন্স ফিকসান নিয়ে একটি আলোচনা।

বৈদেশিক ঋণ প্রসঙ্গে তিনখানি গ্রন্থের পর্যালোচনা।

বসনিয়ার নিধনযজ্ঞের কারণগুলি নিয়ে সমীক্ষা।

বর্ধমানের একটিমাত্র বাঙালি মুসলিম পরিবার থেকে ধারাবাহিকভাবে নেতৃস্থানীয় মানুষদের উদ্ভব কাহিনী নিয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ।

বাঙালি মানস দেবীদুর্গার মধ্য দিয়েই
ঈশ্বরের সমগ্ররূপ কল্পনা করেছে। একদিকে
তিনি জগন্মাতা, অন্যদিকে তিনি কন্যা,
একদিকে তিনি কল্যাণরূপিণী; অন্যদিকে
তাঁর সংহার মূর্তি।

শরতের নির্মল প্রভাতে বাঙালি তাই
অকুণ্ঠচিত্তে তাঁকে আহ্বান জানাতে পেরেছে:

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার হেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা :
১১ এসপ্ল্যানেড ইস্ট
ফোন : ২৪৮ ৫৯২০

ব্যাঙ্গালোর :
৩ সেন্ট মার্কস রোড
ফোন : ৫৮ ৭০০৩

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ২
শরৎ ১৪০০

স্বামী বিবেকানন্দ : সৈনিক সন্ন্যাসী   সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী   ১০১
বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার অনালোকিত রূপ   সুরজিৎ দাশগুপ্ত   ১১২
জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ   গৌরী আইয়ুব   ১২৪
কবিতা ও তৃতীয় বিজ্ঞান   আনন্দ ঘোষ হাজরা   ১৩৬

কবিতা

কবি   প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত   ১১৬
কাঠ   সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত   ১১৭
আগুন কিংবা   সজল বন্দ্যোপাধ্যায়   ১১৮
মৌরিগ্রামে   বাসুদেব দেব   ১১৯
আরো এক কদম   শান্তিকুমার ঘোষ   ১২০
জন্মের মধ্যে মনুষ্যজীবন   রবিউল হুসাইন   ১২১
কবিঠাকুর বাঙলায় কথা বলো   কমলেশ সেন   ১২২
আজ মানুষের কথা বলো   সুবীর ঘোষ   ১২৩

গল্প

ঝড়ঝঞ্ঝা   শুভমানস ঘোষ   ১২৯

ধারাবাহিক রচনা

মাটি   সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়   ১৪৫

গ্রন্থ সমালোচনা

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়   ১৪৮   ভবতোষ দত্ত   ১৫১   অশোকেন্দু সেনগুপ্ত   ১৫৩
মেঘ মুখোপাধ্যায়   ১৫৮   বেণু গুহঠাকুরতা   ১৬১

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম
পরিবারের চিন্তা – চেতনার ধারা   কাজী সুফিউর রহমান   ১৬৪

আন্তর্জাতিক

সভ্যতার কলঙ্ক – বসনিয়ার গৃহযুদ্ধ   পুলকনারায়ণ ধর   ১৭২

মতামত

কি ধরনের কসমোপলিট্যান সমাজ আমাদের কাম্য ?   ১৭৬   বি জে পি বেড়ে ওঠার জন্য যারা দায়ী তাদের সমালোচনা নেই কেন ?   ১৭৭   মৌলবাদ এবং ধর্ম   ১৭৮   ধর্মীয় মৌলবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা   ১৭৯   প্রসঙ্গ মৌলানা আজাদ   ১৮০   জাত বৈষ্ণব কথা : একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে   ১৮৪

কলিকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক সাহিত্যিকা, কলিকাতা – ১৯ থেকে মুদ্রিত এবং
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা – ১৩
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত

দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

আমাদের উল্লেখযোগ্য বই

- পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
  ইতিহাস অনুসন্ধান — Rs. 170.00
- সুবীরা জয়সওয়াল
  বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ) — Rs. 80.00
- দিলীপ সাহা
  বাংলা সাম্যবাদী কবিতার দুই দশক (১৯২৭-১৯৪৭) — Rs. 50.00
- সুমিত সরকার
  আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭ — Rs. 100.00
- টম বটোমোর
  মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব — Rs. 50.00
- সুকোমল সেন
  সমাজ বিপ্লবে সংস্কৃতির প্রশ্ন ও ভারতীয় সমাজ (২য় সং) — Rs. 45.00
- টম বটোমোর
  সমাজবিদ্যা : তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা — Rs. 80.00
- ই. এইচ. কার
  কাকে বলে ইতিহাস ? — Rs.60.00
- সুভাষ ভট্টাচার্য
  বিশ্ব-ইতিহাস অভিধান : ১৭৮৯-১৯৫০ — Rs. 80.00
- অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
  মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি — Rs. 80.00
- গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
  সংহতি লাঞ্ছল গণবাণী — Rs. 70.00
- Sekhar Bandopadhyay & Suranjan Das (ed.)
  Caste and Communal Politics in South Asia — Rs. 200.00
- Deepika Basu
  The Working Class in Bengal : Formative Years — Rs. 180.00
- Sourin Banerji
  News Editing in Theory and Practice — Rs. 190.00
- Bidyut Chakraborty (ed.)
  Whither India's Democracy ? — Rs. 200.00

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১২

স্বামী বিবেকানন্দঃ সৈনিক সন্ন্যাসী

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বহু-মাত্রিক মানুষ বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মতো এমন সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী বাংলাদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে শুধু শাস্ত্রজ্ঞ বৈদান্তিক, লোকশিক্ষক, পরিব্রাজক, ধর্মোপদেষ্টা, প্রচারক ও অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তাই নয়। তাঁর অধীত বিদ্যার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একই সঙ্গে উচ্চাঙ্গ গণিতে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।

অন্যদিকে, তাঁর ব্যবহারিক কর্মকুশলতার সংবাদও সর্বজনবিদিত। তিনি রান্না করতে পারতেন, দাবা খেলতে পারতেন, নাট্যানুষ্ঠান ও অভিনয় করতে পারতেন। নানা ধরনের খেলাধুলায়, ব্যায়ামে, নৌকা চালনায়, ঘোড়া চড়ায়, অসিচালনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিবেকানন্দের মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, পরিহাস রসিকতার ক্ষমতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি বিষয়েও নানা বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর লিপিকুশলতা ও বাগ্মিতা সম্পর্কে কিছু লেখা বাহুল্যমাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা ও কর্মধারা বিচার করলে মনে হয়, তিনি যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আজ থেকে একানব্বই বছর আগে, ১৯০২ সালে, বিবেকানন্দের অকাল—তিরোধান ঘটে, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে। এশিয়ার জাগরণ তখন ভাল ক'রে আরম্ভ হয়নি। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রবল জোয়ার তখনও এদেশকে প্লাবিত করেনি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গড়েও ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী-আন্দোলন বাংলার তথা সারাভারতের চিত্তভূমিকে সেই ক'রে স্বদেশ-প্রেমের বান ডাকিয়ে আমাদের প্রাণের ধারাকে শতমুখ ক'রে তুলেছিল, সেই আন্দোলনের সূত্রপাত বিবেকানন্দের প্রয়াণের কয়েকবছর পরে। অথচ সে-যুগেই বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার যে অংকুর বপন করেছিলেন সেই অংকুর থেকেই অগ্নিযুগের মুক্তি-সাধনার বিশাল মহীরুহ উদ্গত হয়েছিল। একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, সেই বিশেষ যুগে, স্বামীজি ভারতবর্ষের যে চিন্ময় মূর্তির ধ্যান করেছিলেন, আজও ভারতবর্ষের সামাজিক মুক্তিসন্ধানীরা সেই মূর্তির সাধনাই ক'রে চলেছেন। আজকের সমাজতন্ত্রীরা যে "সমাজতন্ত্র"-কে রূপায়িত করবার স্বপ্ন দেখেন,— ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গৈরিকবসন পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দই সেই আদর্শের প্রথম ভারতীয় প্রবক্তা।

বাস্তবিকই, বর্তমানে ভারতে স্বামীজির মত আর কেউ-ই বোধ হয় জননেতৃত্বের অনুকূল প্রায় সব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসু "বৈদান্তিক", "কর্মযোগী" হিসাবে ও আমেরিকা-বিজয়ী "বীর সন্ন্যাসী" হিসাবে খ্যাত ছিলেন তিনি।

আগেই বলেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সম্পর্কেও তাঁর জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। এই সব আন্দোলনের আর্ন্তজাতিক নেতৃত্বের অনেকের সঙ্গে তিনি অল্পাধিক পরিচিতও ছিলেন।

পরিব্রাজক হিসাবে তিনি আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করেছিলেন। দরিদ্রের কুটিরে অবস্থান ক'রে তাদের আহার গ্রহণ ক'রে, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন।

মহৎ হিন্দু ও বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজির "হিন্দুয়ানি" ছিল না। অন্যদিকে ভারতীয় জীবনপ্রবাহে সব ধর্মের বিশিষ্ট অবদানকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। হিন্দুদের কূপমণ্ডূকতা, আচার-সর্বস্বতা, জাতিভেদ প্রথা, মেকি আধ্যাত্মিকতা ও ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি সম্পর্কে এই বৈদান্তিক-সোস্যালিস্টের প্রবল ঘৃণা ছিল।

ভারতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব

বেদান্ত দর্শন থেকে স্বামীজি যে মৌলিক তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন,

সেগুলি এই প্রকার।

(ক) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্লীন, জগদ্ব্যাপী ও জগদতিরিক্ত এক অখণ্ড চিৎ-স্বরূপ নিত্যবস্তু আছে। শুধু বিজ্ঞানের দেখায় এই নিত্যবস্তুর সাক্ষাত পাওয়া যায় না সত্য। কিন্তু সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মানুভূতিতে ওপ্রেমানুভূতিতে এই অদৃশ্য নিত্যবস্তুর "স্পর্শ" অনুভব করা যায় এবং তখনই মানুষের অন্তরাত্মা অসীমের "স্পর্শ" পেয়ে পুলকিত হয়। একদিক থেকে মানুষ আবশ্যকের (necessity) জগতের বাসিন্দা, জীবসীমায় আবদ্ধ। কিন্তু কলা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত এবং সাহিত্যকে উত্তীর্ণ হলে জীবমানব ভূমাতে (Infinite) প্রসারিত হয়। বেদান্তের কথাটাই হোল, মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, অন্যদিকে সে অমৃতের পুত্র — জীবই ব্রহ্ম [Infinite]।

(খ) জীবাত্মা বা ব্যক্তি পুরুষ এই নিত্যবস্তুর (ব্রহ্ম = Absolute, the Infinite) অংশ এবং ব্রহ্মোপলব্ধিই জীবের পরমশ্রেয়ঃ। এই কথার তাৎপর্য হল যে, নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখতে ও জানতে হবে, তবেই "সত্যকে" জানা হবে। অহং-সীমার মধ্যে মানবাত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা — সত্য অবস্থা নয়। কি ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনার, কি জাতির ঐতিহাসিক সাধনারও মূল কথা হল, কি ক'রে মানুষ কিম্বা জাতি "বিশ্বগত" হয়ে উঠবে— জ্ঞানে, কর্মে এবং প্রেমে।

(গ) ভারতীয় চিন্তাধারা এই নিত্যবস্তু সম্পর্কে কোন যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়নি। ব্যক্তির প্রয়োজন, শক্তি ও সাধ্যানুসারে নানা পথকে স্বীকার করেছে। "যত মত তত পথ", — এটাই ভারতীয় চিন্তাধারার সারাৎসার।

(ঘ) এর ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে কোন একপাথুরে একতার (Monolithic Unity) ধ্বনি ভারতবর্ষের সাধনায় শোনা যাবে না। বরং এই সাধনায় উদারতা, সহনশীলতা এবং চিন্তা, দর্শন ও ঈশ্বরোপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে।

(ঙ) সাধনমার্গও একটি নয়, একাধিক। গুণ, কর্ম, প্রবৃত্তি অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি — এদের যে কোন একটি বা একাধিক পথের মধ্য দিয়ে নিত্যবস্তুর উপলব্ধি হতে পারে।

ভারতবর্ষ বহু জাতি, বহু জনগোষ্ঠী, বহু ধর্ম ও বহু ভাষার দেশ। নানা জাতির সংমিশ্রণে ভারতের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ জন্য ভারতবর্ষে এমন সব বিচিত্র সমাজ-বিন্যাস ও আশ্রম-ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় আচার, লোকাচার বিকাশ লাভ করেছিল, যেগুলি "স্থানিক" এবং পরিবর্তনশীল। ধর্মের সঙ্গে এ সমস্তকে একাকার করে ফেলা মারাত্মক ভুল।

স্বামীজির বেদান্তাশ্রয়ী ভারতধর্মের মূল কথা — নিত্যবস্তুর "একত্ববোধ" এবং অখণ্ড "বিশ্ববোধ"। এই বোধের সংজ্ঞা ও সূত্র বেদ, উপনিষদ ও গীতায় পাওয়া যায়।

স্বামীজি বলতেন, বেদান্ত "বিশ্বজনীন ধর্ম" (Universal Religion)। এই ধর্মের কোন প্রবর্তক নেই। এর কোন সূত্রবদ্ধ সুসমাচার নেই। বেদান্তে কোন নিত্যকৃতোর কিম্বা ধর্মাচরণের প্রস্তাব নেই। সব ধর্মের সারবস্তু বেদান্তে পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপর স্বামীজি যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন — যে "দর্শন" রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজসংগঠনে, শিক্ষায় আমাদের আত্মপরিচয়ের আকাংখাকে চরিতার্থ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল, সেই দর্শনের নামই বেদান্ত।

বিবেকানন্দ ও শিকাগোর ধর্ম মহাসভা

১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ যোগ দেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ঐ সম্মেলনে "হিন্দুত্ব" (Hinduism) সম্পর্কে তাঁর ভাষণ মার্কিন মহাদেশে এবং ভারতবর্ষে অদ্ভুত সাড়া জাগায়। আজ যখন রাজনীতির সঙ্গে, ভোট-পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ধর্মের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, হিন্দুত্বের নানা পাটোয়ারী ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে, তখন স্বামীজির "হিন্দুত্বে"র ব্যাখ্যা সকলেরই পড়ে দেখা উচিত। ঐ বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছিলেন— "We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth" [আমরা যে শুধু সর্বজনীন সহনশীলতায় আস্থাশীল তাই নয়। আমাদের অভিমত হল এই যে, সব ধর্মই সত্য। আমি এমন এক জাতির (অর্থাৎ ভারতীয় জাতি) মানুষ, যে জাতির জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। এই জাতি সব ধর্মের, সব জাতির নিপীড়িত মানুষদের ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছে]।

ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে স্বামীজি বলেছিলেন— "The Christian is not to become a Hindu, or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the other and yet preserve his individuality and grow according to the laws of growth." [খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই। হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদেরও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মকেই অন্য ধর্মের মর্মবাণীটিকে আত্মস্থ করতে হবে। তবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে, বিকাশের নিয়ম মেনে, বিকাশ লাভ করতে হবে]।

ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ দু'সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। যে-ব্যক্তিটি ছিলেন প্রায় অপরিচিত, ধর্মমহাসভায় তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক ওজস্বিনী বক্তৃতার পর তিনি প্রভূত খ্যাতি ও যশের অধিকারী হলেন।

ধর্মমহাসভার কার্যাবলীর মূল্যায়ন ক'রে স্বামীজি বলেছিলেন— "If the Parliament of Religions has shown anything to the world it is this: It has proved to the world that holiness, purity and charity are not exclusive possessions of any church and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that, upon the banner of every religion will soon be written, in spite of his resistance:

"Help and not fight"

"Assimilation and not destruction"

"Harmony and Peace and not Dissension."

"সহযোগিতার হাত প্রসারিত কর, লড়াই করো না"

"আত্মীকরণ চাই, ধ্বংস নয়"

এবং

"সামঞ্জস্য ও শান্তি চাই, বিতণ্ডা ও কলহ নয়"।

স্বামীজির বেদান্ত দর্শনের মূলসূত্র এই কয়টি।

অ্যানি বেসান্ত শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন : "শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত, দ্রুত গতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরম-আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়ার রূপ এই; — ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে যখন আমি তাঁকে দেখলাম। সন্ন্যাসী — তাঁর পরিচয় ? নিশ্চয়ই। কিন্তু "সৈনিক সন্ন্যাসী" তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশী মনে হয়; মঞ্চ থেকে এখন নেমে

এসেছেন; দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়; — পৃথিবীর প্রচিনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যারা কোনমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগে প্রস্তুত নয়।

.....ভারতের বাণীকে তিনি বহন ক'রে এনেছেন, ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সকল দেশের মধ্যে রানীর মত যে দেশ থেকে তিনি এসেছেন — তার মর্যাদার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এই চারণ সন্ন্যাসী। প্রাণবন্ত, শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ, পুরুষের মধ্যে পুরুষ।".....

বিবেকানন্দ ও রাজনীতি

উনিশ শতকের শেষপাদে ভারতে যে রাজনীতি চালু হয়েছিল তার প্রতি স্বামীজির বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাঁর অভিমত ছিল এই যে, — এই রাজনীতি উচ্চকোটির মানুষদের স্বার্থে, কারণ তৎকালীন রাজনীতিকরা যে "ক্ষমতা" দাবি করছিলেন, তা সর্বসাধারণের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবার জন্য নয়, নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। স্বামীজির অভিমত ছিল এই যে, যাঁরা অন্যকে "স্বাধীনতা" দিতে প্রস্তুত নয়, তাঁরা নিজেরা স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। "এদেশের দাসেরা অন্যকে দাস করবার জন্য ক্ষমতা চাইছে" ["Slaves want power to make slaves"]।

স্বামীজি যে নতুন ভারতের কল্পনা করতেন তা গঠন করবার ভার নেবে অভিজাত সম্প্রদায়ের কিম্বা উচ্চবর্ণের মানুষ নয়, দেশের কৃষকসমাজ ও শ্রমজীবী মানুষেরা। তাঁর সেই বাণী বহু বার উদ্ধৃত হলেও, আবার স্মরণ করা যেতে পারে—

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে। জেলে-মালো-মুচি-মেথরের ঝুপড়ি মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, — নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করছে — তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।"

স্বামীজির মতে, উচ্চতর শ্রেণীর মানুষেরা, কি শরীরের দিক দিয়ে, কি প্রাণশক্তির দিক দিয়ে, কি নৈতিকতার দিক দিয়ে জীবন্মৃত। কৃষক, মজুর, চামার, মেথর প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষরাই

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে, তাদের চেয়ে বড় হবে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিষয়ে স্বামীজি কি ভেবেছেন? অন্য ভাষায় প্রশ্নটা তোলা যায়। রাষ্ট্র তো সমষ্টিরই প্রতীক। তাহলে, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটা কেমন? স্বামীজি সমষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে লিখেছেন — "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব; এ' অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে, তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যক্তির কর্তব্য।" স্বামীজির বেদান্তের এটাই মূল কথা।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি ব্যক্তির বাধামুক্ত বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। মানবচরিত্র সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলেই তিনি লিখেছিলেন — "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক।" তাই রাষ্ট্রের কিম্বা সমাজের, কিম্বা সামাজিক অনুশাসনের, অধীনতাকেই "স্বাধীনতা" বলে চালাবার চেষ্টা করেননি স্বামীজি। তাঁর কাছে ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির কল্যাণও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামীজি তাই লিখেছেনঃ "উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা, যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ, ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক — যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে; কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকারে ইচ্ছা, সে প্রকারে ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের সমান সুবিধা যাহাতে সকল সামাজিক ব্যক্তির থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।"

স্বামীজি প্রত্যেক জাতির "স্বকীয় বৈশিষ্ট্য" স্বীকার করতেন। তবে প্রত্যেক জাতির অভ্যুদয়ে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তিনি দেখিয়েছে যে, ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্য হল "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" কামনা; ইংরাজজাতির — "ব্যবসা-বাণিজ্য", "বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও টাকা-পয়সার উপর কর্তৃত্ব" করা। ভারতীয়দের কাংখিত বস্তু — মুক্তি। ব্যবহারিক বৈদান্তিক স্বামীজি এই মুক্তিকে মর্তলোকে স্থাপিত করেছিলেন। সে কথায় পরে আসব।

মর্তলোকে ভারতের জনসাধারণের দুর্গতির জন্য পলিটিসিয়ানদের মতো শুধু বৃটিশ শাসনকে দায়ী করেন নি তিনি। দায়ী করেছেন আমাদের অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত পূর্বপুরুষদেরও।

স্বামীজির মতে, ভারতবর্ষের অবনতির নানা কারণ আছে। অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা না ক'রে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা, "সকলে মিলে কাজ" করার অক্ষমতা, স্ত্রীজাতিকে পদদলিত ক'রে রাখা, দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ ও নিপীড়ন করা, এ'সব কারণসমাবেশ থেকেই ভারতবর্ষের পতন। সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়নকে তিনি "আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ" আখ্যা দিয়েছেন। এই জাতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে জ্ঞানে, কর্মে, শক্তিতে, নতুন বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতায় [যে আধ্যাত্মিকতার মূল কথা — লোক-সংগ্রহ (consolidation of the entire world)] আমাদের মাতৃভূমিকে যে আবার বিশ্বসভায় উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এ' বিষয়ে স্বামীজির কোন সংশয় ছিল না। তিনি লিখেছিলেন — "অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আজ কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না — কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

সেই নিদ্রা ভাঙ্গার পর জাগরণের কোন্ নতুন জগতে উত্তীর্ণ হ'বে ভারতবর্ষ, তা বুঝতে গেলে স্বামীজির ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

স্বামীজির ইতিহাস-দর্শন

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন যে আর্যেরা বিদেশ থেকে আসেনি এবং শূদ্রেরা সকলেই অনার্য ছিলেন না। তাঁর মতে, প্রথমে সকলেই "এক বর্ণভুক্ত" ছিলেন। কালক্রমে, বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণের ফলে সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হল। স্বামীজি বুঝতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা কাদের হাতে ছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যুগে "পুরোহিত শ্রেণী" রাজন্যবর্গের উপর কর্তৃত্ব করতেন। স্বামীজি লিখেছেনঃ "চীন, সুমেরু, বাবিল, মিসরি, খলদে, আর্য, ইরাণি, য়াহুদি আরব, এই সমস্ত জাতির মধ্যে সমাজ-নেতৃত্ব, প্রথম যুগে, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে।"

পুরোহিত-তন্ত্রের বা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাষায় নিন্দাবাদ করা খুব সহজ এবং এই ধরনের সব ব্যবস্থাদি সম্পর্কে উঁচু নীতিজ্ঞানপ্রসূত ঘৃণা প্রকাশ করাও খুব সহজ। সন্দেহ নেই, আমাদের বর্তমান অবস্থা ও মানসিকতার সঙ্গে এ-সব প্রাচীন ব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্য নেই। কি ক'রে এ'সব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, কি করেই বা তারা অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, আর ইতিহাসে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, স্বামীজি তা বুঝতে

চেয়েছিলেন। পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও, স্বামীজি বুঝেছিলেন, সে-সময়কার অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুরোহিততন্ত্র "অগ্রগতির" সহায়ক হয়েছিল। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই সব ব্যবস্থার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন স্বামীজি। বর্তমানে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুরোহিততন্ত্র ঘৃণার বস্তু, তবু হাজার হাজার বছর আগে যখন তা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন এ' ছিল এমন একটা পর্যায় যা প্রাচ্যদেশীয় সমাজকে অতিক্রম করতে হয়েছিল ইতিহাসের নিয়মে।

স্বামীজি লিখেছেন "পুরোহিত প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব। পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড় পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত রাজা প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।"

দ্বিতীয় পর্বে — ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগেও সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় কর্মধারায় কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ক্ষত্রিয়রা নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী হলেও পুরোহিত শ্রেণীর মতো অত স্পর্শকাতর ছিল না। তাদের প্রাধান্যের সময় চারুকলা ও সামাজিক সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয়।

তৃতীয় পর্ব — বৈশ্যপ্রাধান্যের যুগ। এ'যুগেও জনসাধারণ নিষ্পেষিত ও শোষিত হত, তবে নীরবে-অপ্রত্যক্ষভাবে। স্বামীজি বলেছেন, তবুও এ'যুগের অবদান যথেষ্ট। বণিক ব্যবসা-সূত্রে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্য পূর্বের দুই যুগের ভাবসম্পদগুলি দেশে দেশে প্রচারিত হয়। কিন্তু বৈশ্যযুগে সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটে। পূর্বে যে তিনটি পর্বের উল্লেখ করা হল, সেই সব পর্বেই "সাধারণ মানুষ" ছিল শোষিত।

চতুর্থ পর্ব — শূদ্রপ্রাধান্যের যুগ। স্বামীজি মনে করতেন, ইতিহাসের ধারায়, একদা শূদ্রযুগ আসবে। এ' যুগে বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষাবিস্তার ঘটবে, শোষণের মাত্রা হ্রাস পাবে, কিন্তু "সংস্কৃতির মান" আরও নিম্নগামী হবে এবং অসাধারণ প্রতিভার উদ্ভব দিন দিন হ্রাস পাবে।

কল্পনায় স্বামীজি এমন একটি রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন যেখানে পুরোহিতদের "জ্ঞান", ক্ষত্রিয়দের "শাক্তধর্ম ও বীর্য" বৈশ্যদের "উদারনীতি" এবং শূদ্রযুগের অর্থনৈতিক "সাম্য"কে বজায় রেখে ব্যবস্থাদি করা যাবে। অথচ এদের দোষ এই রাষ্ট্রে বর্তাবে না।

একদা বলশেভিকরা বিশশতককে চিহ্নিত করেছিলেন "শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগ হিসাবে। এদের আগেই স্বামীজি ঘোষণা করেছিলেন যে শূদ্রত্বসহিত "শূদ্ররাজ" আসবেই। স্বামীজির আশংকা ছিল যে, শূদ্ররা ক্ষমতা পেলে হয়তো নতুন "সুবিধাবাদী শ্রেণী" হয়ে উঠবে। নিজেদের শ্রেণী-চরিত্র বিস্মৃত হ'য়ে বিত্ত, ক্ষমতা, সামাজিক পদমর্যাদার অপব্যবহার ক'রে "নতুন ব্রাহ্মণ," "নতুন ক্ষত্রিয়", "নতুন বৈশ্য" হয়ে উঠবে। তবে তাঁর আশা ছিল যে, শূদ্ররাজ হবে সহযোগিতামূলক, নিপীড়নহীন, প্রকৃত শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ — "শূদ্রত্বসহিত শূদ্ররাজ"। ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে শূদ্ররা চরিত্রভ্রষ্ট "নতুন শ্রেণী" হবে না। এটাই ছিল স্বামীজির বিশ্বাস।

স্বামীজি ও সমাজতন্ত্র

স্বামীজি ছিলেন ভারতের প্রথম স্বঘোষিত সোস্যালিস্ট। অনেকে মনে করেন সমাজতন্ত্রের একটাই রূপ — "বলশেভিক সমাজতন্ত্র"। আসলে অ-বলশেভিক সমাজতন্ত্র ছিল এবং আছে এবং বলশেভিজমের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ইউরোপে প্রচলিত ছিল। স্বামীজি বেদান্তের পথ বেয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছেছিলেন। কিভাবে সে আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি [শংকরীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত "বিশ্ববিবেক" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]।

আগেই বলেছি পাশ্চাত্যের নানা খাতের, বিভিন্ন চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজির অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। Anarchism, Nihilism, socialism, communism এসব আন্দোলনের সাহিত্য তিনি পড়েছিলেন। এসব আন্দোলনের অনেক নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল, বিশেষত Prince Kropotkin এর সঙ্গে। ইংলণ্ডের শ্রমিক-আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। অবশ্য স্বামীজি যে যুগের মানুষ, সে যুগে, ঐ সব আন্দোলনের শৈশব-অবস্থা। ভাবতে অবাক লাগে, স্বামীজির মত প্রাচ্যাভিমানী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী কি ক'রে একশ' বছর আগে ঘোষণা করেছিলেনঃ Socialism of some form was coming on the board and that "Sudras could be the future ruling class".। আরও ভাববার কথা এই যে, সেই যুগে স্বামীজি কি ক'রে বললেন যে, masses (জনগণই) সব শক্তির উৎস। "Whether the leadership of society be in the hands of those who monopolise learning or wield the power of riches or arms, the source of power is always the subject masses. By so much as the class in power severs itself from this source, by so much it is sure to become weak. But such is the strange irony of fate, that those from whom the power is directly or indirectly derived ...... soon cease to be taken into account by the leading class."

স্বামীজি materialism-কে আশ্রয় করে সমাজতন্ত্রে উপনীত হন নি। চিরায়ত বেদান্তদর্শনের নতুন ভাষ্য ক'রে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌঁছেছিলেন। বেদান্তের কথা হল "জীবই ব্রহ্ম" (The self is infinite)। জীব ও ব্রহ্ম এক" — এই তত্ত্বে উপনীত হ'য়ে বেদান্ত "ঈশ্বর"কেও শুধু ব্যবহারিক সত্তার মর্যাদা দিয়েছে — ultimate reality (পারমার্থিক সত্তা) বলে নি।

জীব-ব্রহ্ম-অভেদ-তত্ত্ব গ্রহণ ক'রে স্বামীজি বললেন — চিৎশক্তির বিচারে, জ্ঞানবলক্রিয়ায়, মুক্তিস্বরূপতায়, জীবাত্মা তুচ্ছ নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়, অনুকম্পার বিষয় নয়। জীব অসীম, অনন্ত, মহাশক্তিধর, সৃজনশীল প্রাণী-জীবই ব্রহ্ম। জীবের কোন বন্ধন নেই, জীব স্বরূপত "মুক্ত"।

"you are free, free, free! Oh blessed am I. Freedom am I. I am infinite. In my soul I can find no beginning and no end. All is my Self"। স্বামীজি ছিলেন "ব্যবহারিক বৈদান্তিক"। তাই তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের অনাধুনিক, ঐতিহ্যানুসারী, শাস্ত্রমনা, দৈব-নির্ভর সমাজ, অনুন্নত অর্থনীতি, জাতপাতসম্প্রদায়ের সংঘাতমুখর "তামসিক" সমাজ, জীবের জীবন ও কর্মকে সসীমত্বে ও জড়ত্বে নিরুদ্ধ রেখেছে। ধর্মের নামে মেকি আধ্যাত্মিকতা, আচারসর্বস্ব গোঁড়ামি, উচ্চবর্ণের শাসন ও শোষণ-মূলাবিভ্রাট — সব মিলিয়ে জীব যে ব্রহ্ম, এ'সত্য স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠে নি। নানাধরনের প্রতিবন্ধকতার ফলে জীব জানে না যে সে অমিত বীর্যের অধিকারী, সৃষ্টিশীল, অনন্য জীব। জানে না যে, স্বরূপত সেই ব্রহ্ম (Infinite)।

স্বামীজি বলতেন, এই সব প্রতিবন্ধকতা ঘোচাও। অভীঃ-মন্ত্রে জেগে ওঠো, দেখবে জীবের বিপুল সম্ভাবনার দ্যুতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কারাবন্ধন ভেঙ্গে জীব নিজেকে সর্বলোকে প্রকাশ করছে, সর্বগত হয়ে উঠছে। জীবকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবের আত্ম-আবিষ্কারের জন্য, সমাজের নবজন্ম প্রয়োজন। লৌকিক জগৎকে, সংসারের কর্মশালাকে বেদান্তের আলোকে উদ্ভাসিত করতে হ'লে, সমাজের পুনর্বিন্যাস চাই-ই, চাই। বেদান্তদর্শনের চরিতার্থতার জন্যই practical vedanta চাই।

"The abstract vedanta must become living-poetic in everyday life".

স্বামীজির কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বেদান্তদর্শনের একটি মূলসূত্রকে নতুন অবস্থা ও নতুন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি বিদেশের সোস্যালিজম্, অ্যানার্কিজম্ প্রভৃতি চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের দোষ-গুণ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে ; সমষ্টিমুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন একান্ত প্রয়োজন। এই মুক্তির জন্য দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, ধর্মমোহ, মেকি আধ্যাত্মিকতা, ভেদ-বুদ্ধি, শ্রেণী-শোষণ — এ' সবের নিবৃত্তি না হলে, মানুষের ভাস্বর মূর্তি যে প্রকাশিত হবে না, বেদান্তদর্শনের সার্থকতা দেখা যাবে না, বিবেকানন্দ-দর্শনের এ সবই মূল কথা। ভারতবর্ষের মানুষের মানসিক জীবনের মোহাবরণ উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন স্বামীজি স্বাদেশিকতা, স্বজাতিপ্রীতি ও সমাজতন্ত্রের পথে। যে পরবশতা ও শোষণ জীবকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন রেখেছে, সেই তামসিক, উদ্ভিদী জীবন পরিহার করে সত্ত্বের প্রকাশধর্মের ও রাজসিক কর্মতৎপরতার আবাহন করেছেন স্বামীজি।

স্বামীজি যে মানুষের জয়গান গেয়েছেন সে মানুষ বন্ধনমুক্ত (free) ; জ্ঞানে, কর্মে, হৃদয়বৃত্তিতে মহীয়ান মানুষ। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে-ওঠা নতুন ভারত — বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও রাজসিক উপাদানে গঠিত নতুন ভারতীয় সমাজ, এই সমাজের অভ্যুদয়ই স্বামীজি কামনা করেছেন।

এ' সমাজে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের প্রাণশক্তির সমন্বয় হবে। এ' সমাজ বস্তুবাদী সভ্যতার উপকরণকে অবহেলা করবার মূঢ়তা পরিহার করবে, এই সভ্যতাকেই ব্যক্তিমুক্তি ও সমষ্টিমুক্তির কাজে লাগাবে।

"We talk foolishly against material civlisation. The grapes are sour. Material civilisation, nay even luxury, is necessary to create work for the poor. Bread! Bread! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven."

বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত

বর্তমান ভারতের এখন যে সমস্যা বিবেকানন্দের যুগে সে সমস্যার চরিত্র ছিল আলাদা। স্বাধীন ভারত উন্নয়নের দৌড়ে অনেকটা এগিয়েছে, তবুও এখনও এদেশে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা আছে। মহাজাতি-গঠনের সমস্যা আছে, জন-বিস্ফোরণের সমস্যা তো আছেই। তাছাড়া আছে জাতীয় সংহতির সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা এবং সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু আজও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা রয়েই গেছে। এবং নবা-হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ম্যে অধুনা সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করেছে।

মত বা মতাদর্শ (Ideology) ব'লে যে-একটা জিনিস মানুষকে অনেক সময় পেয়ে বসে, সেটা অধিকাংশ সময়, বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়। তার অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের মেজাজ ও অন্ধ-সংস্কারের উপরে। আবার মত বা মতাদর্শটা যখন কোন ফল লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষত রাজনৈতিক ফললাভের উপরে, এবং নানাকারণে বহুসংখ্যক লোকের মনকে যখন সেই মতাদর্শ অধিকার করে, বহু লোকের " লোভকে " উত্তেজিত করে, তখন মতাদর্শটি মারাত্মক হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক কালে নবা হিন্দুত্ববাদীরা বহু লোকের অজ্ঞান মনের " লোভকে " উত্তেজিত করে, তাদের তাড়া লাগিয়ে, বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পথে প্রবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে যুক্তির প্রয়োজন হয়নি, কেন না ঐ ভাঙ্গনের পথটা ছিল সহজ, সঙ্গে ছিল দ্রুত ফললাভের আশা। নবাহিন্দুত্ববাদীরা খুব শীগগীরই দিল্লীর মসনদে বসবে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে উত্তর-ভারতের হিন্দু-মনকে মাতিয়ে রেখেছে।

আজও খন্ডিত ভারতবর্ষেও কয়েক কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ছাড়া কি " জাতীয় সংহতি ", কি "জাতীয় পুনর্গঠনে"র আশা সুদূরপরাহত। উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদ, গোঁড়ামি, কূপমন্ডূকতা প্রকৃত মিলনের পক্ষে যে বিরাট অন্তরায়, এ কথা অনেকেই বোঝেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যবসা অলাভজনক নয়, এবং এই ব্যবসার সঙ্গে আজকালকার সুবিধাবাদী রাজনীতিও যুক্ত।

বিবেকানন্দের সময়-কালে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এত প্রকট হয়নি। তবুও জানতে ইচ্ছা হয়, স্বামীজি এ সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন।

স্বামীজি এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেন নি। তবে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর আলমোড়া থেকে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে স্বামীজি লিখেছিলেন : "যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বীগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশরূপে সাম্যের সমীপবর্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণই এই গৌরবের অধিকারী।

আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদান্তের মত যত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদান্ত নাই, বাইবেল নাই, কোরান নাই.....

" আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আদর্শ।.....

" আমি দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামের দেহ লইয়া ভবিষ্যৎ ভারত গৌরব-মন্ডিত হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক, এই দ্বিবিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ আদর্শের বিকাশ সাধন করিয়া ভারতবাসী কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে।"

আগেই বলেছি স্বামীজির সময়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং প্রতিযোগিতা এখনকার মতো প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। এবং স্বামীজির জীবনের প্রধম ব্রত ছিল মৃতকল্প হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা। কূপমন্ডূক, আচার-সর্বস্ব হিন্দু সমাজকে নতুন ভাবাদর্শে গড়ে তোলা। হয়ত এ' জন্যই স্বামীজির পত্রাবলীতে লেখায়, বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিশদ আলোচনা নেই।

তবে ১৮৯৭ সালের ১০ ই অক্টোবর স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। অনাথ আশ্রমে কাদের নেওয়া হবে এই প্রসঙ্গে স্বামীজি লিখেছেন " মুসলমান বালকদেরও লইতে হইবে বৈ কি।"

তিনি আরও লিখেছেন :

"ভাবানা প্রেমরূপে সর্বভূতে যখন প্রকাশমান, তখন আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজা হে বাপু! বেদ, কোরান, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক। প্রত্যক্ষ ভগবান — দয়া প্রেমের পূজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ। লোক না পোক্। হিন্দু মুসলমান, কৃশ্চান সকল জাতের ছেলে লও তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগা হয় আর ধর্মের সাধারণ যে সর্বজনীন ভাব, তাই শিখাইবে।" আর স্বামীজির কথাই ছিল " অনাথ, দরিদ্র মূর্খ চাষাভুষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে, যদি সময় থাকে ত, ভদ্রলোকের জন্য।"

দারিদ্র্য সমস্যা

স্বামীজি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে পিছিয়ে - পড়া ভারতবর্ষের মূল সমস্যাটা হল দারিদ্র্যের সমস্যা। তিনি লিখেছিলেন - "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা - সোপানে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।"

শিকাগো ধর্মমহাসভাতেও তিনি বলেছিলেন যে — ভারতবাসী ভাতের কাঙ্গাল — ধর্মের কাঙ্গাল নয়। তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন জোগান দিতে হইবে। কারণ — "ক্ষুধার্ত লোকদিগকে ধর্মের কথা বলা বা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

মার্কিনীদের জীবনযাত্রার মান দেখে স্বামীজি বুঝেছিলেন ভারতের দারিদ্র্য কত ভয়াবহ। তাই স্বামীজি লিখেছিলেন, "যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করে, সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম-কর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ'।"

আমেরিকায় ধর্ম-প্রচারে গিয়েও স্বামীজি বলেছিলেন - "বিবেকানন্দের কোন ধর্ম নাই। যতদিন পর্যন্ত ভারতের একটি বিড়াল, একটি কুকুর পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে ততদিন বিবেকানন্দের কোন ধর্ম নাই।"

স্বামীজি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "যে-ধর্ম, যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা হীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটি দিতে পারে না, আমি সেই ধর্মে বা সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" আবার —

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? যারা একটুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে?"

স্বামীজি যে অমৃতবাণী রেখে গেছেন তা এই : "ভারতকে উঠাইতে হইলে, গরীবদের খাওয়াইতে হইলে, শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে; আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে;- ব্রাহ্মণই হৌন, সন্ন্যাসীই হৌন, আর যিনিই হৌন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে।"

হিন্দু সমাজের সমালোচনায় বিবেকানন্দ

স্বামীজি ছিলেন অসামান্য তেজস্বী পুরুষ। মন্ত্রবদ্ধ শাস্ত্র-বদ্ধ, অনুশাসন-নির্ভর হিন্দুসমাজের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। কোন ধরনের কূপমন্ডূকতা, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি কিছুতেই স্বামীজি সহ্য করতে পারতেন না। কোন অনুদারতার স্থান ছিল না তাঁর দর্শনে ও কর্মধারায়।

স্বামীজি ছিলেন সাচ্চা গণতন্ত্রী। তিনি বলতেন, সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও ভেদবুদ্ধিতে জর্জরিত ভারতীয় সমাজকে সংহতি, উদারতা ও ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। জাতপাতে স্বামীজির বিশ্বাস ছিল না। তিনি লিখেছিলেন জাতের ব্যাপারটা "এক্ষণে স্ফটিকের মত এক বিশেষ নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারত-গগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।" হিন্দু সমাজ হতে এই পচা দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য লোকের সামাজিক সত্ত্ববুদ্ধি জাগ্রত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন স্বামীজি। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বাঙালি চরিত্রে দেখেছিলেন ভণ্ডামি, ন্যাকামি, চালাকি, ছুঁচোমি ভাবের ঘরে চুরি, সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতা ও নানা ধরণের দুর্বলতা। এ সব তাঁর ধাতে সইত না। সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার উঁকিঝুঁকি দেখলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন।

স্বামীজি জীবিত থাকলে এখনও পড়ে-পাওয়া বুলির কাঙাল দেশবাসীকে বলতেন, "দেখিতেছ না সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়-বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে .... যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই - কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণ, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পূর্বপুরুষদের নাম-কীর্তনে, — সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

স্বামীজি নিশ্চয়ই চাইতেন আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি। কিন্তু তাঁর আরও বড় কথা ছিল, আমাদের এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে হবে। হাতে পাওয়া পুঁজি ভাঙ্গিয়ে বেশি দিন চলে না। পুঁজি খাটিয়ে বাড়াতে হয়। স্বামীজি তাই নাকি-সুরে

কান্না অপছন্দ করতেন। নেই, নেই শুনলে বিরক্ত হতেন। তাঁর জীবন-বাণী ছিল আধুনিক। তিনি লিখেছেন — "বল্ অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। [illegible]তোক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ও রে হতভাগাগুলো [illegible] নেই বলতে বলতে কুকুর বিড়াল হয়ে যাবি নাকি? কি [illegible] নেই? কার নেই? শিবোহহং শিবোহহং। নেই নেই শুনে [illegible]র মাথায় যেন বজ্র মারে। .....ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনহীনা [illegible] - ও' হ'ল ব্যারাম — ও কি দীনতা? ছুঁচোগিরি করবি তো [illegible] পড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

স্বামীজি আরও বলেছেন, "আমি কাপুরুষ[illegible] করি", "আমি কাপুরুষদের সঙ্গে ও রাজনৈতিক আহাম্মা[illegible] কোন সংস্রব রাখতে চাইনি।"

স্বামীজির মুক্তি-তত্ত্ব

ভারতীয় দর্শনে "মোক্ষ" বা "মুক্তি" কে [illegible] বলা হয়েছে। স্বামীজি "মুক্তি" বলতে বুঝেছেন দেশের জাতির মুক্তি, জড়বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। তাঁর মতে শুধু নিজের মুক্তি-সাধনায় "মুক্তি" নেই ; মুক্তি জগৎ-হিতে, সর্বসেবায়, জীবপ্রেমে।

পরিহাসরসিকতা করে তিনি বলেছেন — "দাদা, মুক্তি [illegible] চারবার নরক কুন্ডে গেলেও বা।" — আবার "[illegible] তোল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানুষি কথা! রাম রাম! .... ও কোন্ দেশী বিনয় — আমি কিছুই জানি না — আমি কিছুই নই — ও কোন্ দেশী বিনয় ও বৈরাগ্য হে বাপ্! ও-রকম দীনহীন ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানি নি তো — কোন্ শালা জানে? তুমি জানো না, তো এতকাল কল্লে কি? ও-সব নাস্তিকের কথা — লক্ষ্মীছাড়া বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব, যার ভাগ্যে আ[illegible] সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে — আর লক্ষ্মীছাড়া[illegible] বেড়ালের মতো কোণে বসে মেউ মেউ করবে।"

বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয় যে তিনি ছিলেন [illegible], দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট। জগতকে তুচ্ছ [illegible] অস্বীকার করেন নি। ইউরোপের ভোগবাদী [illegible] প্রতি নেতিমূলক মনোভাব নেননি। বেদান্তকে তিনি [illegible]ছিলেন ব্যবহারিক, সর্বজীবের কল্যাণই ছিল তাঁর আদর্শ।

বিবেকানন্দ ও শিক্ষাবিচার

স্বামীজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও চেতনা ছাড়া সমাজের পরিবর্তন হবে না, — হলেও সে-পরিবর্তন স্থায়ী হবে না। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি, সুষ্ঠু সমাজসংগঠন, কর্মদক্ষতা — সব কিছুর পূর্বশর্তই হল, শিক্ষা। তাঁর শিক্ষা-ভাবনার মূলসূত্রটি হল — মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা অন্তর্লীন হয়ে আছে, সেই পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে [Education is the manifestation of the perfection that already is in man"]।

বিবেকানন্দের মতে "জ্ঞান" মানুষজীবের মধ্যেই আছে। "জ্ঞান মানুষে অন্তর্নিহিত, কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে ..... যেমন একখন্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ "জ্ঞান" মনের মধ্যেই রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি ঘর্ষণস্বরূপ সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়।"

বেদান্ত বলে যে; জীব — "বুদ্ধ" অর্থাৎ "জ্ঞানস্বরূপ"। [illegible]টপতঙ্গ, জন্তুজানোয়ারেরা তা নয়। মানুষ নানা দিক থেকে [illegible] জগতে অনন্য। মানুষই ভাষা শিখতে পারে, হাল-লাঙল, [illegible] চালানো শিখতে পারে, গণিত, বিজ্ঞান শিখতে পারে, গান [illegible] পারে, আঁকা শিখতে পারে কারণ — "জ্ঞান" মানুষে [illegible] আছে। শিক্ষায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। জ্ঞানশক্তি [illegible]র সুপ্ত ক্ষমতাকে পূর্ণতা দান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

[illegible]দানের বেলায় শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, [illegible] প্রবণতা, [illegible] বিচারটাই বড় কথা। শিক্ষক কিংবা অভিভাবক নিজেদের [illegible] ও ভাবনা অনুযায়ী কতকগুলি "সংবাদ" শিক্ষার্থীর মগজে [illegible] দিলেই শিক্ষাদান হল না।

"আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুর এই-সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এ-সব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে এগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা উহা না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ শিশুকে এ'ভাবে নষ্ট করা হইতেছে।"

বিবেকানন্দ শিশুকে দেখেছেন স্বতন্ত্র, স্বাধীন জীব হিসাবে। কাজেই শৈশবাবস্থা থেকেই শিশুকে স্বাধীন চিন্তায় প্রবৃত্ত করবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কৃতিকে এক ছাঁচে ঢালবার যে-কোন প্রচেষ্টার তিনি বিরোধী

ছিলেন। ছোটদের উপর অসঙ্গত শাসনেরও তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন।

স্বামীজির মতে শিক্ষার " মূল লক্ষ্য " চরিত্র-গঠন ও মানুষ তৈরী করা। প্রকৃত মানুষের থাকবে সুন্দর স্বাস্থ্য, আত্ম-বিশ্বাস, কুসংস্কারমুক্ত, মার্জিত মন। তাঁর মতে, ঘরকুনো মানসিকতা ত্যাগ করে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতবাসীর বেরিয়ে পড়া উচিত। সর্বোপরি চাই স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা। আধুনিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি দু'টি - শ্রদ্ধার অভাব ও নৈতিকতার অভাব। অথচ, শ্রদ্ধা না থাকলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হবে না, আর নৈতিকতার অভাবে শিক্ষার মাধ্যমে " গোটা মানুষ " তৈরী-ও হবে না।

স্বামীজির শিক্ষাভাবনা যথেষ্ট আধুনিক। শিক্ষা এমন হবে যার মধ্য দিয়ে শুধু গ্রন্থকীট তৈরী হবে না, তৈরী হবে আত্মপ্রত্যয়ী, জীবনসমস্যা সমাধান-পটু মানুষ। পাঁচটা লাইব্রেরী মুখস্থ করেও মানুষ শিক্ষিত নাও হতে পারে। নানা ভাব, নানা চিন্তার, নানা কৃৎকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ও চরিত্র গড়ে তুলতে না পারলে, শিক্ষা সফল হল বলা যাবে না। স্বামীজির মতে, কেতাব-সর্বস্ব, পরীক্ষা-সর্বস্ব ও চাকুরি-সর্বস্ব শিক্ষা, শিক্ষার প্রহসন মাত্র।

স্বামীজির অভিমত ছিল যে, শিক্ষায় যদি পরার্থপরতা না জাগে ও মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না হয়, তবে সে শিক্ষার মূল্য নেই।

জনশিক্ষা

দেশের জনশিক্ষার বিষয়ে স্বামীজির বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি যে নতুন ভারতবর্ষের কথা ভাবতেন, তার সার্থক রূপায়ণ যে একমাত্র জনশিক্ষার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব, এ' বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। স্বামীজি লিখেছিলেন — "যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সমর্থ হই তবু দরিদ্র ঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না। কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া তাহার পিতাকে কৃষিকার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপ জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করিবে। সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সকল স্থানে পৌঁছিতে হইবে।"

নারীশিক্ষা

সমাজ পরিবর্তনে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, স্বামীজি ক্রমিক পরিবর্তনকে কাম্য বলে মনে করতেন। ভারতের নারী-সমাজের চরম দুর্দশা দেখে স্বামীজি নারীশিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকারভেদ আত্যন্তিক হয়ে ওঠেনি। শিক্ষার ব্যাপারেতো নয়ই। পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব বর্ণকে যেমন কোণঠাসা করে, তেমনি নারীকেও স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। স্মৃতিগ্রন্থগুলির সমালোচনা করে স্বামীজি বলেন, ভারতের পুরুষরাই নারীকে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে পরিণত করে তাদের অধিকার ও সম্মান কেড়ে নিয়েছে। স্বামীজির বিচারধারা ছিল এই ধরনের।

স্বামীজি লিখেছেন — " যে জাতি এবং যে-দেশ নারীকে সম্মান করে না, তাহারা কখনও মহৎ হইতে পারে না, ভবিষ্যতেও কখনও পারিবে না।" তিনি বলতেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান কারণ, তারা নারী-জাতিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পেরেছে। মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজি বলেছেন — কন্যাদেরও সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করতে হবে, যত্নসহকারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। স্বামীজি নারীজাতির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল, বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের "স্বাধীন মতামত" দেবার অধিকার থাকা উচিত। তবে বিধবা-বিবাহের তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, বিধবারাই স্বেচ্ছায় ও স্বতঃ-প্রণোদিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তারা পুনরায় বিবাহ করবে কিনা। পুরুষদের এই ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভাল।

স্বামীজির অভিমত ছিল এই যে, ভারতীয় কৃষ্টির মূলকথা পারিবারিক শুচিতা ও মাধুর্য। স্ত্রী সহধর্মিণী এবং মাতৃত্বেই নারী-সত্তার চরিতার্থতা। সু-নাগরিক গড়ে তুলতে গেলে সু-মাতার প্রয়োজন। এবং সে জন্যই স্বামীজি নারীর কল্যাণী রূপের অভিব্যক্তির আদর্শ মনে রেখে, নারীদের শিক্ষার আয়োজন করবার কথা বলেছেন।

স্বামীজি লিখেছেন — " ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আমাদের পুঁথিপত্রও মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের অধিকারে রক্ষিত।"

স্বামীজি আরও লিখেছেন — " এক কথায় আমি উহাদিগকে

[পুঁথিপত্রাদিকে] সর্বজনাধিগম্য করাইতে চাই। আমি এই সকল ভাবধারাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাই; উহা সাধারণ সম্পত্তি হউক।"

একথা সত্য যে, স্বামীজি বলেছেন — "ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।" যে-ধর্মশিক্ষা স্বামীজি চেয়েছিলেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল তুলনামূলক, পরমতসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মানুষে-মানুষে ভাবগত ঐক্য গড়ে তোলা। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থতো ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা নয়। সমকালীন দুনিয়ায় যখন শিক্ষিত সমাজ বিত্ত, ক্ষমতা, পদ ও বৈষয়িক উন্নতির ইঁদুর-দৌড়ে যোগ দিয়ে অবসন্ন ও ক্লান্ত, ভোগসর্বস্ব জীবনদর্শনের বাইরে আর কোন বিকল্প যখন তাদের সামনে নেই, তখন স্বামীজির শিক্ষাভাবনার নতুন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তাঁর নির্দেশে এবং নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের যে শিক্ষা-কর্মসূচী গৃহীত হয়, সেখানে শুধু ধর্মশিক্ষার কথা নেই। চারু ও কারুশিল্প শিক্ষা, জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি ও বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা, কারিগরি বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা, ব্যায়াম শিক্ষা, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা প্রভৃতি সবই আছে।

স্বামীজি বলতেন : " মানুষ গড়তে পারে এমন তত্ত্ব আমরা চাই। এখানেই সত্যের পরীক্ষা, যাহাই তোমাকে দেহে, মনে, আত্মায় দুর্বল করিবে — তাহাই বিষবৎ পরিত্যাগ করো। সত্য শক্তি দেয়। সত্যই শুদ্ধি। সত্য সর্বজ্ঞান। সত্য শক্তি দিবে, জ্ঞান দিবে, প্রাণ দিবে। যে সকল অতীন্দ্রিয়বাদ মানুষকে দুর্বল করে, তাহা ত্যাগ করো। শক্তিমান হও। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ তত্ত্বই সবল, সহজ — তোমার নিজের অস্তিত্বের মতোই সরল সহজ।"

স্বামীজি চারপ্রকার যোগের আদর্শ প্রচার করেন ——— প্রেম, কর্ম, জ্ঞান ও শক্তি। এদের মধ্যে ঐকাসাধন করে এক সমন্বিত শিক্ষাদর্শনের কথা স্বামীজি বলে গেছেন।

বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার অনালোকিত রূপ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

১৯৯৩-র সেপ্টেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতাদানের ১০০ বছর শুরু হল। ঐ ধর্মসভাতে তিনি গিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের স্বনিযুক্ত প্রতিনিধি রূপে। কত কষ্ট করে তিনি ঐ ধর্মসভার মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন তা আজ বহুজনবিদিত এবং হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের অভিনবত্বও বহু আলোচিত. তাছাড়া যে-কথাগুলি বলে তিনি ২৭ সেপ্টেম্বরের ভাষণ সমাপ্ত করেছিলেন সেই কথাগুলি বহু উল্লেখের ফলে আজ আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু ঐ শিকাগো বক্তৃতাগুলিতে তিনি এমন কতকগুলি কথা বলেছিলেন যেগুলি কেন বলেছিলেন অথবা ঐ কথাগুলি বলার বিশেষ কারণ কী ছিল কিংবা মার্কিন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কথাগুলির কোন বিশেষ তাৎপর্য ছিল কিনা তা নিয়ে আগ্রহ চোখে পড়ে না। এখানে ঐ ইঙ্গিতগুলির অর্থ অন্বেষণের চেষ্টা করব।

শিকাগো ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯২-তে আরব্ধ এক বিশ্বমেলার অংশ রূপে। আর ঐ বিশ্বমেলা আয়োজিত হয়েছিল ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকায় প্রথম পদার্পণের ৪০০ বছর স্মরণোৎসব রূপে। 'নতুন পৃথিবী'তে কলম্বাসের এই পদার্পণকে প্রচলিত ইতিহাস বইগুলোতে যতই গৌরবান্বিত করে দেখানো হোক-না কেন, প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটির একটা ভয়ঙ্কর শোচনীয় দিকও ছিল। এই দিকটি ইয়োরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান রেনেসাঁসের স্বল্প আলোচিত একটি রূপ। অথচ রেনেসাঁসের দূর প্রসারিত এই পরিণামটি না জানলে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাগুলির, বিশেষত ১১ আর ২৭ সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত ভাষণের, প্রকৃত তাৎপর্য অবগুণ্ঠিত থেকে যাবে বলে মনে করি।

১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকোলাস এক সমাপ্তিসূচক ক্রুসেডে বা ধর্মযুদ্ধে ভারত ও ভারতীয় দ্বীপগুলির অবিশ্বাসীদের 'বিশ্বাসী করার পরিকল্পনা' — কে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্যে পর্তুগালকে এক 'বুল' বা ধর্মীয় আজ্ঞা দেন। ধর্ম প্রচারে পর্তুগালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে আর এক ধর্মীয় আজ্ঞাবলে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত নতুন দেশে পর্তুগালকে যে অধিকার দিয়েছিলেন পর্তুগাল তাকে একচেটিয়া অধিকার বলে ব্যাখ্যা করত। পর্তুগালের এই ব্যাখ্যা প্রকারান্তরে মেনে নিয়ে স্পেন ১৪৮১-র ঐ আজ্ঞার সংশোধনের জন্য বারবার আবেদন জানালে কালনেমির লঙ্কাভাগের মত পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার পুনরায় ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীকে ৩৮ দ্রাঘিমা রেখা বরাবর দুটি ভাগ করেন — পূর্ব ভাগের একচেটিয়া অধিকার দেন পর্তুগালকে আর পশ্চিম ভাগের একচেটিয়া অধিকার দেন স্পেনকে।

স্পেনের পক্ষ থেকে কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে কিউবার কাছে গুয়ানাহানি দ্বীপের মাটিতে নেমে সেখানে খ্রিস্টানদের পবিত্র ক্রস পুঁতে দ্বীপটির নতুন নামকরণ করেন সান সালভাদোর অর্থাৎ পবিত্র পরিত্রাতা। প্রকৃতপক্ষে 'নতুন বিশ্বের' এই খ্রিস্টানীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনাকে স্মরণ করেই ৪০০ বছর পরে বিশ্বমেলার আর তার অংশ হিসাবে শিকাগো ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই জন্যই যে কক্ষে বিশ্ব ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়, তার নাম দেওয়া হয় — 'হল অফ কলম্বাস'। কিন্তু মনে রাখা ভাল যে অশোক বা আকবর যেরকম ধর্মসভার আয়োজন করেছিলেন শিকাগো ধর্মসভা ঠিক সেরকমটি ছিল না। শিকাগো ধর্মসভার উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল সে প্রশ্নে পরে আসব।

তার আগে দেখা যাক, মহান রেনেসাঁসের স্বল্প আলোচিত অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপটি। এই রূপটির অন্তর্গত হল দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের যুগ এবং যুগটির সবচেয়ে বিখ্যাত তিন ব্যক্তিত্ব হলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা আর ফার্দেনান্দ ম্যাগেলান। কলম্বাস ভারতে পৌঁছবার জন্যে যাত্রা শুরু করে এক 'নতুন বিশ্বে' পৌঁছেছিলেন এবং ফার্দেনান্দ ম্যাগেলান জাহাজে করে জলপথে প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন, যদিও পথেই তাঁর মৃত্যু হয়, তবু তাঁর পরিকল্পনা হিসাবে তাঁর একটি জাহাজ ঐ বিশ্ব পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেছিল বলে তার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়।

কলম্বাস মোট চারবার অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়েছিলেন — ১৪৯২, ১৪৯৩, ১৪৯৮ এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর এই অভিযানগুলির পরিণাম হল আজটেক, ইনকা, মায়া প্রভৃতি সভ্যতার ধ্বংসসাধন; স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মূলীকরণ, সোনা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন এবং অবশিষ্ট ও বন্ধুভাবাপন্ন স্থানীয় অধিবাসীদের খ্রিস্টানীকরণ। স্পেনের 'নতুন বিশ্ব' বিজয়ের প্রধান ঐতিহাসিক ফার্নান্দেজ দে ওভিদের মতে কলম্বাস, কর্টেজ, পিজারো প্রমুখের স্থানীয় অধিবাসী নির্মূলীকরণের ফলে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৫০০ আমেরিন্ডিয়ান বা রেড-ইন্ডিয়ানও জীবিত ছিল কিনা সন্দেহ। একটা হিসাব অনুসারে ১৪৯৪ থেকে অর্থাৎ কলম্বাসের দ্বিতীয় অভিযান থেকে ১৪৯৮ অর্থাৎ তৃতীয় অভিযানের মধ্যে কলম্বাস ও তাঁর অনুগামীরা খুব কম করে তিন লক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন।

নৃশংসতায় ভাস্কো দা গামার স্থান আরও উপরে। তিনি প্রথমবার ভারতে আসেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভারতে আসার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। ধর্মের সংজ্ঞা এক-একজনের কাছে এক-একরকম হয় এবং ভাস্কো দা গামারও ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা ছিল। তাই দ্বিতীয়বার তিনি ২০টি জাহাজ নিয়ে এসে ভারতের উপকূলে হত্যার তাণ্ডব লাগিয়ে দেন। নিষ্ঠুরতায় তাঁর অসীম উল্লাস হত। ১৪৯৮-এ প্রথমবার যে-ব্রাহ্মণ গামার উপকার করেছিলেন কালিকটের শাসক জামোরিন সেই ব্রাহ্মণকেই পাঠালেন হত্যার উৎসব থেকে গামাকে নিবৃত্ত করার জন্য। আর গামা পুরনো উপকারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে জামোরিনকে ফেরত পাঠালেন রান্না করে খাওয়ার জন্য। আগেই বলেছি যে বিশ্ব পরিক্রমার পথে ম্যাগেলানের মৃত্যু হয়। কী ভাবে মৃত্যু হয় ? ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপিনের এক দ্বীপের অধিবাসীদের জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরিত করতে গেলে ক্রুদ্ধ দ্বীপবাসীরা তাঁকে হত্যা করে।

মহান রেনেসাঁসের ভয়ংকর পরিণামের যেটুকু পরিচয় দিয়েছি তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাবলির একাধিক ইঙ্গিতগর্ভ উক্তির তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনার উত্তরে ১১ সেপ্টেম্বর তিনি যে ভাষণ দেন তার শেষাংশে বলেছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধতা ও তার ভয়াবহ পরিণাম এবং ধর্মের নামে উন্মত্ততা বহুকাল এই সুন্দর পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সব জিনিস বিশ্বকে হিংসায় পূর্ণ করেছে, মধ্যে মধ্যে রক্তে স্নান করিয়েছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সমস্ত জাতিগুলিকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর রাক্ষস না থাকলে মানব-সমাজ আরও বহু উন্নত হতে পারত। কিন্তু তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি একান্ত ভাবে আশা করি যে এই ধর্মসভার সম্মানে আজ সকালে যে ঘণ্টা বেজেছে তা আসলে ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি বা লেখনী দিয়ে সাধিত সমস্ত অত্যাচারের এবং মানুষে মানুষে সমস্ত অসদ্ভাবের মৃত্যু-ঘণ্টা।"

আবার ২৭ সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশ মন দিয়ে শোনা যাক। তিনি বলছেন, "যদি এই ধর্ম মহাসভা জগতে কিছু প্রমাণ করে থাকে তবে তা এই যে পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোনও বিশেষ একটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের একচেটে সম্পত্তি নয় আর প্রত্যেক ধর্মই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সব চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, যদি কেউ স্বপ্ন দেখে যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং শুধু তার ধর্মই একচেটে প্রতিষ্ঠা পাবে তাহলে আমি তাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে করুণা করি ; তাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে অচিরেই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপরে লেখা হবে : 'বিবাদ নয়, সহায়তা,' 'ধ্বংসসাধন নয়, আত্মীকরণ,' 'মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসে। বিবেকানন্দ কেন এখানে 'সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধতা ও তার ভয়াবহ পরিণাম এবং ধর্মের নামে উন্মত্ততার কথা তুললেন ? কাদের আচরণে এইসব মানসিকতার প্রতিফলন বিবেকানন্দ দেখেছিলেন ? আবার ১৬ দিন পরে পবিত্রতা, শুদ্ধতা ইত্যাদিতে ধর্ম-বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের কথাই বা তুললেন কেন ? কোন ধর্ম ঐসবে একচেটিয়া অধিকার দাবি করে ? কেনই বা তেমন মানুষের কথা তুললেন যে-মানুষ স্বপ্ন দেখে যে শুধু তার ধর্মই থাকবে, ধ্বংস হবে বাকি সব ধর্ম ? এখানে তাঁর ইঙ্গিতটা কলম্বাস বা ভাস্কো দা গামা ও তাঁদের অনুগামীদের দিকে না অন্য কারও দিকে ?

এইসব প্রশ্নের উত্তর যাঁরা চট করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন তাঁদের একটুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলে আমি এখানে বিবেকানন্দের আর একটি বক্তৃতার উল্লেখ করতে চাই।

আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ সাড়ে তিন বছর পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকা ও ইয়োরোপে তিনি যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্য ভারতবর্ষের নানা শহরে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনাগুলির উত্তরে তিনি যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির শেষ বক্তৃতাটির একটি অংশ এখানে উল্লেখ করি।

'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামে পরিচিত এই বক্তৃতার একস্থানে

বলছেন, "বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ অর্থহীন। ঐ বিবাদে কী লাভ হবে? বিবাদ আমাদের আরও বিভক্ত করবে, দুর্বল করবে, আমাদের নিচে নামিয়ে ফেলবে। ভারত থেকে একচেটে অধিকারের দিন, একচেটে দাবির দিন চিরদিনের মত দূর হয়ে গিয়েছে। এটাই ভারতে ইংরেজ অধিকারের সুফল। মুসলমান অধিকারেও একচেটে অধিকার খর্ব হয়েছিল — এটা মুসলমান অধিকারের মহা সুফল।" এখানে তিনি মুসলমান অধিকারের ফলে কারা বা কোন একচেটে অধিকারে ঘা পড়েছিল বলে ইঙ্গিত করেছেন? কোন একচেটে অধিকারের দিন চলে যাওয়াকে তিনি মহা সুফল বলেছেন?

মুসলমান অধিকারের ফলে ভারতে শুধু সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বিলোপকেই বিবেকানন্দ 'মহাসুফল' বলে মনে করেননি, তার সঙ্গে আরও যে সুফল দেখা গিয়েছিল তার কথাও বলেছেন। সেই আরও সুফলটা কী? তিনি বলছেন, "মুসলমানের ভারতবর্ষ অধিকারের ফলে দরিদ্র পদদলিতদেরও উদ্ধার হয়েছিল। ঐতিহ্যে দেশের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এটা শুধু তরবারির জোরে হয়নি। শুধু তরবারি ও বন্দুকের জোরে এটা হয়েছিল মনে করাটা নিতান্তই পাগলামি।"

এটা পরিষ্কার যে কোনও দেশে বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মাবলম্বীর বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার অর্থাৎ একাধিপত্য থাকবে এই ধারণাটার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল সহমতা, আত্মীকরণ, সমন্বয় ও শান্তি। লক্ষণীয় যে এখানে তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে সম্পূর্ণ নীরব। মনে হয় যে তিনি আগে থেকে ভেবেচিন্তে যে-বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন সেটি হল ১৯ সেপ্টেম্বরের বা ধর্মসভার নবম দিবসের বক্তৃতা; আর ১১ এবং ২৭ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতা দুটি শিকাগোতে পৌঁছে পরিস্থিতি অনুসারে উপস্থাপিত বক্তব্য। নবম দিবসের অনুষ্ঠান-সূচি অনুসারে হিন্দু ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতাতে তিনি গীতা থেকে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধার করে বলেছিলেন যে, মুক্তোমালার প্রতিটি মুক্তোর মধ্য দিয়েই সুতোটি যায়, তেমনই প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান। ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে যুগে যুগে ঈশ্বর আবির্ভূত হন বলে গীতার বক্তব্যটি যতখানি জনপ্রিয় সমস্ত ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর অনুসৃত বলে বক্তব্যটি ততখানি জনপ্রিয় নয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে বিদেশী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে সমস্ত ধর্মেই ঈশ্বরের মহিমা বর্তমান এই তত্ত্বটাকে বিবেকানন্দ বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোনও ধর্মের একাধিপত্য বা একচেটিয়া অধিকারের দাবিটাকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

এতক্ষণে নিয়ে আসছি শিকাগো ধর্মসভা আহ্বানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রশ্নটাকে। প্রথমেই কবুল করে রাখি যে এই প্রশ্নটার যথাযথ উত্তর দেওয়ার মত উপযুক্ত দলিল-কাগজ আমার হাতে নেই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখছি যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্স নামে একটি সংস্থা শিকাগো, নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট প্রভৃতি শহরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন বসত নায়েগ্রা শহরে। এটি ছিল প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের একটি সুসংগঠিত সংস্থা, ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী ধর্মনেতা জন কালভিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত; এবং অন্য কোনও প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের উল্লেখ না পাওয়াতে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সংগঠনটাই ছিল শিকাগো ধর্মসভার প্রধান বা একমাত্র উদ্যোক্তা।

কিন্তু ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিকাগো ধর্মসভা আহ্বানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বোধগম্য বা স্পষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদের সম্মিলন ঘটানোই ছিল শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আপাত উদ্দেশ্যর অন্তরালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি? প্রকৃতই কি ব্যাপারটা খুব সহজ সরল ছিল?

প্রকৃত ব্যাপারটা কী ছিল সেটা বোঝার জন্যে তিনটি তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম তথ্যটি বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাগুলির মধ্যেই জ্বলন্তভাবে উপস্থিত। তথ্যটি হল কোনও বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 'একচেটে' অধিকার বা একাধিপত্যের তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং হিন্দু ধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের একই ঈশ্বর বিদ্যমান ও অন্যান্য ধর্মও শ্রদ্ধেয় চরিত্রের জন্ম দিয়েছে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। মনে হয় যে তাঁর সামনে কোনও প্রতিপক্ষ ছিল এবং সেই প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক বা অলিখিত উদ্দেশ্যকেই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য রূপে তিনি নির্ধারণ করেছিলেন; একই সঙ্গে তিনি প্রতিপক্ষের বক্তব্যের বিপরীতে ঘোষণা করেছেন সমস্ত ধর্মের মধ্যে সহায়তা, সমন্বয় ও শান্তির কথা। বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকেই শিকাগো ধর্মসভার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটাকে আমাদের অনুমান করতে হবে।

এবার এই অনুমানের সমর্থনে আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। কিন্তু তার আগে দেখা যাক যে ধর্মসভার মঞ্চে বিবেকানন্দের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের ফলে মার্কিন সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর সমবেত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার উত্তরে বিবেকানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ শেষ হলে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব

দৃশ্য — বহু মহিলা বেঞ্চের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বিবেকানন্দের কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এই দৃশ্যের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর আবির্ভাব ও অভিভাষণ সভাগৃহে কী পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিরিশ বছরের এক অখ্যাত ব্যক্তি যে রূপ যৌবন, কণ্ঠস্বর, অভিনয় ও ব্যক্তিত্বের অভিনবত্ব দিয়ে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলের — বিশেষত মার্কিন মহিলামহলের — গর্বিত বিচারবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করেছিলেন এ-বিষয়ে কোথাও কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাতে বোধহয় নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্সের কর্মিবৃন্দই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রবল অভিঘাত প্রতিরোধের জন্যে এঁরা সংস্থা নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে লিখিতভাবে ঘোষণা করে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিল। এই অধিবেশনে ঘোষিত পাঁচটি সূত্রসূচির মধ্যে প্রাসঙ্গিক দুটি সূত্র হল: (১) বাইবেল অভ্রান্ত অতএব তার কোনও ঘটনা ঐতিহাসিক কিনা অথবা কোনও তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত কিনা তার বিচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; এবং (২) এটা পূর্বনির্ধারিত যে ঈশ্বর মনোনীত জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কর্তৃক বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হবে; অন্য তিনটি সূত্র হল খিশু খ্রিস্টের জন্ম ও উত্থানের তত্ত্বগুলিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে। এই সূত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে এ. সি. ডিকসন এবং আর. এ. টোরে-র সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে 'দি ফান্ডামেন্টালস: এ টেস্টিমোনি টু দি ট্রুথ' নামে পুস্তিকামালা প্রকাশিত হলে নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্সের উদ্যোক্তাগণ ১৯০৯ থেকে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' বা 'মৌলবাদী' বলে পরিচিত হন। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের আগে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উপরে ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য স্থাপনের তত্ত্বকে কালভিনিজম বা কালভিনবাদ বলা হত, কিন্তু তুল্য অর্থে 'ফান্ডামেন্টালিজম' বা 'মৌলবাদ' বলে শব্দটার প্রয়োগ ছিল না।

এবার ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণ প্রস্ফুটিত আলোকে শিকাগো ধর্মসভার পেছনে নিহিত উদ্দেশ্যটাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। এই বিশ্ব ধর্মসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ১৪৯২-এর ১২ অক্টোবর 'নতুন বিশ্বে'র মাটিতে নেমে ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম যে-কাজটি করেছিলেন অর্থাৎ ক্রস পুঁতে নতুন দেশে নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা সেই কাজটি সম্পন্ন করা, তবে সেবারে কাজটির যে-রূপ ছিল এবারে অবশ্যই সেই একই রূপ অনুসৃত হত না; এবারে বহু ধর্মাবলম্বীকে এক মঞ্চে সমবেত করে বিশেষ একটি ধর্মকে বিশ্ব ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। আজ যে-কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয় তা এই যে স্বামী বিবেকানন্দই বিশ্ব ধর্ম হিসাবে বিশেষ একটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন সব ধর্মেই ঈশ্বর বিদ্যমান এবং সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও শান্তির আদর্শ প্রচার করে। এটাই স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার সবচেয়ে বড় তাৎপর্য।

[স্পেনের ইতিহাসের জন্য R.B. Merrimen এর The Rise of the Spanish Empire, কালভিনবাদের জন্য New Cambridge Modern History vol. II (ii), নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্সের ও মৌলবাদের জন্যে G.T. Cobb- এর Modernism vs. Bible Christianity ও S.G. Cloc-র History of Fundamentalism এবং রেনেসাঁসের কুফলের জন্যে R.S. Kinsman সম্পাদিত The Darker Vision of the Renaissance দ্রষ্টব্য।]

কবি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

নীল রঙে ভরা ছিলো আমার কলম, নীল রঙে এখন সবাই
উঁকি দিচ্ছে, কিছুটা আকাল, আর বারোমাস কত্তোরকমের ঘাস,
মানুষ কোথায় মানে ? মানুষ তো সবজায়গায়, আর আমরা ক'জনে
মাঝেমাঝে রং পালটিয়ে নিই, কিন্তু তক্ষক গিরগিটি নই, নিছক মানুষ,
আমিও একজন ঐ কুদনগুঞ্জনরত গাঁইয়া কালোছেলে —

কবি , নীল রং পছন্দ করি বলে নীলরঙে কিছু একটা লিখি।
দ্যাখো দেখি, কী কাণ্ড ঘটে গেলো এইদিকে, দ্যাখো,
সবাই তো এসেছিলো সবার অতিথি হ'য়ে, দরজা খোলা ছিলো,
আমি যেরকম রাখি কলমকে খুলে, যদি কিছু লিখে ফেলে, লেখে
তেমনই রেখেছি খুলে, প্রায় সেরকম, নরমগরম
গলা শোনা যায়, যে বাঁচায় সে নিজে মরে না —

বেঁচে যায়, সব বেঁচে আছে, মরে যায় বাঁচবার সুখে,
যারা বলেছিলো "আর বাঁচতে চাই না", সে দাঁড়ালো রুখে,
সে, আমি, তুমি, আমরা সবাই — মানুষ, আকাল, ঘাস।
এর মধ্যে কতো কী যে ঘ'টে গেলো, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে, পরিসরে —
কিছু একটা গোলমাল কে বাঁধিয়ে দিয়েছে সহজে।

কাঠ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বেজে ওঠো আসবাব আমার। কোন একদিন
তুমিতো মর্মরে ছিলে। পূর্ণিমার চাঁদবেণু
তোমাকে বাজাতো আর তুমি দুলতে দুলতে
শিখে নিতে নক্ষত্রগুঞ্জন।

আজ কাঠ হয়ে, দালানদখল হয়ে
স্থির চোখে, দেখছো আমাকে ;
দেখছো কাবার্ডে ওই ওস্তাদো কা ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ,
অসম্ভব বড়ে গুলাম, জয়ী ভীষ্মদেব — সব রেকর্ডে উন্মুখ !
তুমিই মেহগিনি হয়ে, সভ্যতাসংকেত হয়ে ঘিরে রেখেছো এদের !
কখনো বা ফ্রেম হয়ে দাঁ ভিঞ্চি, পিকাসো
তুলুস লোত্রেকের মাস্টারপ্রিন্টের পাহারায়
সুন্দরকে স্তম্ভিত করেছো ঐ দেয়ালশুভ্রতায়।
আমি দেখছি এবং একা প্রস্তরনিস্তব্ধ হয়ে
স্থির শুয়ে আছি !
শরীরের নিচের শয্যায়ও সেই অরণ্যের বুক খালি করা কাঠ !

এখন চাইছি আমাকে জাগাক কেউ
ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জীবন্ত মূর্তির মতো স্পষ্ট দাঁড় করাক ;
এখন এঘরে জ্যোৎস্না খরচ হয়ে যাবে,
দিগন্তদূরত্ব থেকে নেমে আসা চাঁদবেণু
আমাকেও নিশ্চিত বাজাবে,
কিন্তু তার, আগেই তুমি বেজে ওঠো কাঠ
শ্মশানমর্মর হয়ে ওঠো,
আমার চিতার সঙ্গে সারারাত তুমিই করবে সঙ্গত।

আগুন কিংবা

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুন
শিখা নেই এবং পুড়িয়ে দিচ্ছে —

আমার মুখ আগুনের মুখ
আমার চোখ আগুনের চোখ
আমার জিভ আগুনের জিভ—

দীর্ঘশ্বাসে ছাই উড়ছে
আর আগুন নিয়ে খেলছি —

ঘর যাচ্ছে — বার যাচ্ছে
শুধু আগুন আর আমি

আগুনকে সাক্ষী রেখে
আগুনের সাক্ষী হওয়া
এবং
এভাবে সব কিছু হতে হতে
কিছুরই থাকা নয় —
আমারও নয়, আগুনেরও নয় -

শুধু আগুনের বিবরণ,
শুধু আমার বিবরণ,

চারদিকে বাতাস
চারদিকে ছাই .....

মৌরিগ্রামে

বাসুদেব দেব

তখনই মৌরিগ্রামে শুয়েছে অথই রাত ছেঁড়া কুয়াশায়
এককোণে শাদা ভিজে বেড়াল ও কিছু দূরে হাওড়া শহর
স্টেশন চত্বরে শুধু ভ্যাগাবন্ড বগি একখানা
লেভেল ক্রশিং জুড়ে পড়ে আছে থোকা থোকা
পোকা কাটা মানব হৃদয়

পড়ে আছে নারকেল মালা
বিকল টেমপো ও ট্রাক অজস্র জমেছে দুইদিকে
তখন উদভ্রান্ত সেই অনির্দেশ্য ছায়াপথ থেকে
স্বপ্ন নয় নিরাপত্তা নয় আকাশকুসুম নয়
মৃত্যুভয় অবিশ্বাস সংশয়ের বীজপাত হয়

তখনই মৌরিগ্রামে সিগনাল না পেয়ে থামে
শতাব্দী এক্সপ্রেস

আরো এক কদম

শান্তিকুমার ঘোষ

আরো এক কদম আমরা এগিয়ে গেলাম
পরিণামের দিকে...
ফুটো তাঁবু, পুরনো তৈজস আর ছেঁড়া পুঁথিপত্র নিয়ে।
আর একটা নতুন বছরের দুয়ার-খোলার ধ্বনি —
মরুভূমির সাঁজোয়া-গাড়ী, উপসাগরের মাইন ছাড়িয়ে।
নতুন জন্মের পয়মন্ত তারা রক্তসন্ধ্যার আকাশে।
কোনো বিস্ময় অপেক্ষা করছে কি ঢেউয়ের আড়ে।
দিক-দেশ আলো ক'রে দ্বিতীয় আবির্ভাব!
এখন সবাই সবার এত কাছাকাছি —
উৎসুক উৎকর্ণ,
কানে ধারাপতনের ছন্দ,
চোখে — শুকনো ডালে পাতার ধীর জাগরণ।

জন্মের মধ্যে মনুষ্যজীবন

রবিউল হুসাইন

এখন ঘোর অন্ধকারের কাল
মানুষের সংখ্যাধিক্যে পৃথিবীতে জায়গা নেই আর
জন্মভূমি মরুভূমি পাহাড় পর্বত সব মানুষের অধিকারে
জাতিসংঘ ভবনের সম্প্রসারণ খুবই জরুরী
ওই সুউচ্চ দালানে নতুন নতুন মানুষের নতুন নতুন
রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্যে আর জায়গা হয় না।
ইতিমধ্যে একটি শুভসংবাদ ঘটেছে
যদিও গত বছর মানুষের ফুসফুসকে মাছের ফুসফুসে
রূপান্তরিত করার বৈপ্লবিক অধিকারের জন্যে
একজন বাঙালি মৎস্যজীবী নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন
তার আবিষ্কার কর্কট আর এইড্‌স্ এর প্রতিশোধক আবিষ্কারের
চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন দিগদর্শনের জন্ম দিয়েছে
স্থলভূমি ছেড়ে তার পন্থায় নিপীড়িত মানুষ সহজেই
মৎস্যকৌশলে জলের অতল জগতের যেখানে-সেখানে
বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে এই ভয়াবহ সংকটের কালে
আবিষ্কারটি পৃথিবীর অসহায় মানুষদের নতুন করে
বাঁচার পথ-নির্দেশ করেছে
দলে দলে তাই মানুষেরা নদ-নদী আর সমুদ্র জলের ভেতর
ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘড়বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছে
জলে এখন তাই মাছ-তিমি নয়
মানুষেরাও ডুব সাঁতার কাটে
আদিকালের মতো ওরা তাই নানাবিধ কারণে
অতিদ্রুত মাছের আদলে রূপান্তরিত হতে চলেছে
সবই পাল্টে যাবে স্মৃতি মানুষ জন্মভূমি সায়াহ্নের পথ
পাল্টাবেনা কিছুতেই পাল্টাবেনা কোনোকালেই
অন্ধকার শৈত্য সময় আর শুদ্ধ সত্য মত

কবি ঠাকুর, বাঙলায় কথা বলো

কমলেশ সেন

চোখ যদি এমনই হয় তোমার স্বদেশ, বাঙলার
হাঁটু থেকে নামে জল মাটিকে ভেজায়
গাছের শিকড়ে যোগায় খাদ্য
এবং আর্তি,
তবে এমন দিনে কবি ঠাকুর, তুমি গান গাও
তোমার পুত্রদের হাতে দাও গাছ ভেঙে
জীবনের কলম।

এ-শবর জাতি কিরাতের বংশধর আমরা
আমাদের চোখে এ-মাটি আর্য নয়,
বংশের গর্বে আমরা বাঙলা বলি
বাঙলার মানচিত্রে যদি লিখি শবরভূমি
তবে কবি ঠাকুর, তোমার বাঙলার মান থাকে।

তুমি ধনুকের সাথে তোমার আত্মার গরব নিয়ে
বাঁচো, স্বদেশের মান রাখো।

তুমি চিরদিন বাঙলায় কথা বলো।

আজ মানুষের কথা বলো

সুবীর ঘোষ

আজ মানুষের কথা বলো
যে মানুষের আজ নিকষ অসুখ ;
গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল
আর কচিপাতার সবুজ
কিন্তু সে মানুষটি যে শুয়েই আছে
তার চোখ কেন এসব কিছু দেখছে না ?

শোনা যায়, আমরাই তাকে মেরেছি
বারবার সন্দেহ ক'রে তাকে করেছি পঙ্গু
তাকে হাঁটতে দিইনি আঙিনায়
সে চলে গেলে গোবরছড়া দিয়েছি।
যে মানুষ একদিন ছুটতো ঘোড়ার মতো
যে হাসতে পারতো কালবৈশাখী
ঝড়ের মতো দ্রুত
তাকে আমরা আশীর্বাদ করেছি :
অথর্ব হও
সে তাই ভূমিশয্যা নিয়ে
আমাদের দেখাতে চেয়েছে
সে আমাদের ভীষণই আজ্ঞাবহ।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ

গৌরী আইয়ুব

একটা রাজনৈতিক 'চক্রান্ত' অনুযায়ী বিদায়ী শাসকরা যে মানচিত্র ধরে জনসংখ্যার জেলাওয়ারী হিসেব করে ১৯৪৭ সালে দেশটাকে লাল পেন্সিল দিয়ে ফেড়ে ফেলেছিল সে কথা সবাই জানে। কিন্তু এবার যে দেশটা ভিতর থেকেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে এ বিষয়েও তো দ্বিমত নেই। ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে জমির ভাগ নিয়ে, জলের বাঁটোয়ারা নিয়ে যে প্রবল মতবিরোধ এবং পরস্পর বিরোধী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে বিদ্বেষের প্রকাশ সাম্রাজবাদী বিদেশীদের বিরুদ্ধে যতখানি ছিল তার চেয়ে খুব কম নয়। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি পৌঁনে দুশ' বছরে যত হিংসার প্রকাশ ঘটেছিল তার অনেক গুণ বেশি ঘটেছে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে, স্বদেশী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রতি। এক রাজ্যের বাসিন্দারা অন্য রাজ্যে নিগৃহীত হচ্ছে — যেন সবটুকু ভারতবর্ষ সব ভারতবাসীরই স্বদেশ নয়। উত্তর ভারতের 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' দক্ষিণ ভারতের অসহ্য মনে হচ্ছে।

কখনও বা একই রাজ্যের ভিতরে ভাষা নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, আঞ্চলিক আনুগত্য নিয়ে, চাকুরীর ভাগ নিয়ে শুধু নয়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের ভাগাভাগি নিয়েও রক্তপাত ঘটছে। এই পশ্চিম বাংলাতেই কেবল গোর্খারা কি ঝাড়খণ্ডীরাই যে নিজেদের শোষিত মনে করেন তাই নয়, উত্তরবঙ্গের বাঙালির মনেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগ ঘোঁয়াতে শুরু করেছে। অর্থাৎ জাতীয় দেহের সর্বপ্রত্যঙ্গে ধ্বসা রোগ দেখা দিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পরে অন্তর্বিরোধের এই সব উপসর্গ যে দেখা দেবে তার লক্ষণ আগেও চোখে পড়েনি এমন নয়। কোনো কোনো নৈরাশ্যবাদী পূর্বাহ্নেই আমাদের সাবধান করবার চেষ্টাও করেছিলেন যে বিদেশী শাসকদের দূর করে দিলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, "বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইবে তাহা নহে"। কারণ, "যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোন দিন নিষ্কৃতি পাইবে না।" তবে স্বভাবতই স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে সে সব ভয়-ভাবনা তখন ভেসে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল বিদেশী শাসনের চেয়ে মন্দতো আর কিছু হতে পারে না। অতএব ওটাকে প্রথমে দূর করা যাক। তারপরে ছোট ছোট ভেদ-বিভেদগুলিকে দূর করা যাবে। বাইরের শত্রুরা বিদায় হবার পরে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে গৃহশত্রুরও অভাব নেই। বলতে গেলে এখন আমরা সবাই সবার গৃহশত্রু। ফলে কার কাছ থেকে কতটা ছিনিয়ে নিতে পারি তারই রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ চলছে দেশজুড়ে। প্রায়ই সেটা খুনোখুনির পর্যায়েও নেমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে কি ভাবে কাদের কতটুকু পাইয়ে দিতে পারলে কত দিন ঠাণ্ডা রাখা যাবে তার হিসাব-নিকাশ রাজনীতি ব্যবসায়ীরা করতে থাকুন।

সাধারণ নাগরিকদের এখন ভেবে দেখতেই হবে, এই বিদ্বেষ — রোগের চিকিৎসা কী, এর মূলেই বা কী বিষ আছে। কারণ এটা সবারই অস্তিত্বের প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরা এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা, বিচার-বিবেচনা করতে না শিখলে কী করে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে মত দান করবে? আবার এত বড় দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্যও আশা করা যায় না।

কিন্তু কতগুলি মূলগত নীতির ব্যাপারে অনেকখানি সহমত হবার প্রয়োজন আছে। ক্রমাগত আমাদের চিন্তাভাবনা- গুলিকে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। পার্থক্য ও বিরোধগুলিকে যথাসম্ভব আপোষে মিলিয়ে আনার চেষ্টাও দরকার। যেমন কিনা আমরা যারা মনে করি যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করার পূর্বশর্ত হল গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা, তারাও হয়ত গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিষয়ে সবাই একমত নই। আবার আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই যারা মেকি ঘোষণা করে সংখ্যাগুরুর ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবার উপর চাপাতে বদ্ধপরিকর, কিংবা এই গণতন্ত্রকেই যারা নানা ভাবে গণতন্ত্রের পরিহাসে পরিণত করে চলেছে তাদেরও সবার সঙ্গেই তো আমাদের তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটাই মতবিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র সত্য উপায়।

যাইহোক এই আলোচনা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই তিনটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করি:

(১) জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হতে বাধ্য?

(২) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কি অনিবার্যত জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই?

(৩) জাতীয়তাবাদের আত্মঘাতী সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য আজই আমাদের দেশে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার ব্যাপক চর্চা কতখানি সম্ভব?

এই প্রশ্নগুলির একটা প্রেক্ষিত আছে। এই পত্রিকার গত মার্চ মাসের সংখ্যায় গৌরকিশোর ঘোষ অত্যন্ত দুঃসাহসী বলা উচিৎ সংসাহসী-সুবিশ্লেষিত একটি প্রবন্ধে ('ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার') পরামর্শ দিয়েছিলেন, "জনমনে কসমোপলিটান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ এবং প্রসার ক্রমাগত না ঘটাতে পারলে সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবই নয়।" হিন্দুবাদীরা আজ জাতীয়তাবাদের নামে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যে প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে তারই সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদীদের একত্র করার তাড়নায় লেখা এই প্রবন্ধটি আরও অনেকের মতো আমাকেও উদ্দীপ্ত করেছে ঠিকই। তবু জাতীয়তাবাদের প্রতি আমার আবাল্যের আসক্তি অতিক্রম করতে পারছি না বলেই উপরের প্রশ্ন তিনটি আমার মনে জেগেছে এবং আমাকে নিরন্তর ভাবাচ্ছে। আজ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে যখন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার সময় এসেছে তখন জাতীয়তাবাদের প্রতি এই দুর্বলতা হয়ত খুবই ক্ষতিকর, তা সত্ত্বেও এই ভাবনাগুলিকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

আমি শেষ প্রশ্নটিই প্রথমে আপনাদের সামনে পেশ করছি। কেন, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা মানবেন্দ্রনাথের অনুসারীদের কাছে আন্তর্জাতিকতা কিংবা বিশ্বমানবিকতার ধারণা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে গিয়ে থাকলেও এই শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থই যে ক'জন বোঝেন সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে মহিলা প্রার্থিনীদের ভাবনাচিন্তা পর্যবেক্ষণ করার একটি সংপ্রয়াস দেখেছিলাম খবরের কাগজের প্রতিবেদকদের মধ্যে। হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রার্থিনী জনৈকা মুসলিম মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাবরি মসজিদ যে এঁরা ধ্বংস করলেন এ বিষয়ে তাঁর মত কি? তিনি নাকি জবার দিয়েছিলেন, "ও তো অন্য দেশে হয়েছে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?" প্রতিবেদক অবশ্য জানাননি যে এর পরে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন কি না যে অন্য দেশ বলতে উনি কী বোঝেন। অযোধ্যাটা আমাদের বাংলাদেশ নয় এই কি তাঁর বক্তব্য? কিংবা ভারতবর্ষের অন্য কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টির কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। অথবা ভারতবর্ষ বলতে কী বোঝায় তাই তিনি জানেন না। তাঁর ধারণাটা সেদিন ঠিক মতো ধরতে না পারলেও একথা আমাদের অজানা নেই যে শতকরা পঁচাত্তর জন ভারতবাসী তাঁর দেশের মানচিত্রটাও ঠিকমতো চেনেন না। অবশ্য ইদানীং দূরদর্শনের আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের কল্যাণে দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতার অবস্থান বিষয়ে সম্ভবত একটা ধারণা হয়েছে অনেকেরই এবং ঐ চারটি শহরই যে আমাদের দেশ এটাও মনে হয় তাঁরা বুঝতে পারেন। তবু অযোধ্যাটা আমাদের দেশ কিনা, ঢাকা অমৃতসর তক্ষশীলা রাওয়ালপিন্ডি আমাদের দেশ কিনা এ বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকতেই পারে।

অতদূরেই বা যাবার দরকার কী? উলুবেড়িয়ায় কোনো কোনো নির্বাচনপ্রার্থিনী হয়ত জানেন না যে কুচবিহার অথবা মজঃফরপুর তাঁর দেশ না পাকিস্তান না বাংলাদেশ। আর প্রার্থিনীর কথাই বা ধরছি কেন? ক'জন পঞ্চায়েত নির্বাচন-প্রার্থী পুরুষ শুধু নয়, ক'জন পঞ্চায়েত প্রধানই বা নিজের দেশের চৌহদ্দীর খবর রাখেন? অথবা তাঁর জেলার বাইরে পা দেবার সুযোগ কতবার পেয়েছেন? বাস্তব পরিস্থিতিটি যখন এই রকম তখন এদেশের সব উঠতি নাগরিকদের মনে তার রাজ্য, তার রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রসাদী চেতনা, একটা আপনকরা আবেগ জাগানোটাই কি প্রাথমিক দায়িত্ব নয়? ছোট ছোট আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি আমরা কি করে ঠেকাব যদি না বৃহত্তর দেশটার প্রতি একটা ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারি? এই মন্ত্র বড় দেশটার ভালমন্দ, ভাঙাগড়া, ওঠাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকটি নাগরিকের ভালমন্দের যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে সেটি অনুভব করাতে যদি না পারি তবে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধই বা কী করে ঠেকানো যাবে?

তাই আমার মনে হয় একটা দেশাত্মবোধ, একটা জাতীয় চেতনা ভারত রাষ্ট্রের অখণ্ডিত অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। ন্যাশনালিজম-এর এত যে বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও মনে হয়েছিল, "যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে — কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে যে প্রাণ পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে — আমাদের চিত্তকে,

আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে।" এই উপমহাদেশতুল্য দেশের বিরাট জন-সমাজকে মেলাবার জন্য দেশটার ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল, এর বহু বিচিত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা, এই দেশের প্রতি একটু মমতা (অহঙ্কার নয়) — এই সদর্থক ভাবগুলি জাগানোর চেষ্টা করলেও কি অবধারিত ভাবে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদে পরিণত হবেই? "অহঙ্কার ছাড়া জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না" — একথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু জাতীয়তবোধ? তার জন্য দেশের প্রতি অল্প একটু মমতাই কি যথেষ্ট নয়?

আমাদের অনেকের মনেইতো ভারত নামে দেশটার প্রতি গভীর মমতা আছে, তার নিন্দায় বা তার ক্ষয়ক্ষতিতে প্রাণ কাঁদে — তাই বলে কি দেশকে সমস্ত বিচারবুদ্ধি কিংবা ন্যায়অন্যায় বোধের উপরে তুলে রাখছি? "যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি" তাহলে আমরা কখনোই "ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে ...বিরোধের আদর্শকে খাড়া" করব না। এই রাবীন্দ্রিক শিক্ষা কি গ্রহণ করা সম্ভব নয়? My country, right or wrong—এটা নির্বোধ অনুদরদর্শীর উক্তি। ঠিক যেমন my family — right or wrong কিংবা my community — right or wrong এই দুটিও অশ্রদ্ধেয় উক্তি।

শ্রীলঙ্কা কি নেপাল কি বাংলাদেশ অথবা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যদি আমাদের সরকার কিংবা দেশের নাগরিকদেরও একাংশ অন্যায় আচরণ করে তবে কি আমরা তার নিন্দা করব না? চোখ বুঁজে সমর্থন করব? অবশ্য অনেক সময়েই এজাতীয় দুর্ব্যবহারের সপক্ষে আগে থেকেই এত (কু) যুক্তি আর (মিথ্যা) তথ্যও দেওয়া হতে থাকে যে বহু সৎ ভারতীয় নাগরিকদের কাছেও শ্রীলঙ্কায় আমাদের সৈন্য নামানো কিংবা নেপালের সীমান্ত ঘিরে বাণিজ্যিক অবরোধকেও আর অসঙ্গত মনে হয় না। তবু যদি আমরা সতর্ক থাকি তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দাবিয়ে রাখার জন্য, কিংবা নিজের দেশের আর্থিক-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার যখনই অন্যায় আচরণ করবে আমরা তার নিন্দা করতে পারব মুক্ত কণ্ঠে। আমাদের দেশপ্রেমকে সন্দেহ করলেও, দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করলেও মানবধর্মকে তার উর্দ্ধে তুলে রাখতে শেষ পর্যন্ত সাহসী হব কিনা জানি না, কিন্তু সেটাই যে আমাদের কর্তব্য সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বজনীন নীতি বোধেরও যদি চর্চা করা হয় তবে নিশ্চয়ই জঙ্গী জাতীয়তাবাদ শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় জাতীয়তার আবেগকেই অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে — এটা কি কোনো কাজের কথা হোল? এটা বাস্তবে সম্ভব কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

উগ্র জাতীয়তাবাদের এবং সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রেরও প্রতিষেধক হিসেবে গণতন্ত্রকে এদেশে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেবার কথা অনেকেই বলছেন। তার উপায় হিসেবে গ্রামস্বরাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথাও ভাবছেন। আশাকরি তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে গ্রামজীবনেও কতখানি অশান্তি আর নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। পঞ্চায়েত গ্রামের কতখানি উপকার করছে তা গ্রামীণ মানুষই বলতে পারবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাকা পয়সা ক্ষমতা প্রতিপত্তি নিয়ে গ্রাম পর্যায়েও যে দুর্নীতি আর হিংসাবিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। তাই মনে সন্দেহ জাগছে, সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক কর্তব্য আর অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার প্রকৃষ্ট উপায় কি এই ভাবে গ্রামে গ্রামে দলবাজি, খুনোখুনি, কর— দাতার অর্থে স্বজনপোষণ আর 'নির্বাচিত' প্রতিনিধির শ্রীবৃদ্ধি? এর বিকল্প কী তা নিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ যেসব ভাবনাচিন্তা করছিলেন তাকে আমরা বিশেষ আমল দিইনি। কিন্তু নিজেরাও তো অন্যকিছু ভেবে বার করতে পারিনি।

এদিকে 'গণতন্ত্র' যে ভাবে শুকনো 'তৃণমূলে' ছড়িয়ে চলেছে তাতে সত্যিকার স্বায়ত্ত শাসন আর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে কি? অথবা গ্রামীণ মানুষকে পীড়নের এই নতুন যন্ত্র গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে? বিষয়াস্তরে যাবার আগে ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই একটি উদ্ধৃতি উপহার দিই "এক সময় পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিষ ছিল, এখন গবর্মেণ্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল। ...যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বত:প্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে — তাহা ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করিবে — এই পঞ্চায়েতের পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে।".....শতাব্দীর শেষ বর্ষে পা দিয়ে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

মেকি স্বায়ত্ত শাসনে দুর্নীতি একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দুর্নীতি, অরাজকতা, প্রশাসনের প্রতি সর্বব্যাপী অনাস্থা, আত্মঅবিশ্বাস, সর্বমঙ্গলদাতা এক নেতৃত্বের জন্য আকুলতা এবং অবশেষে সেই-প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নেতা ও তার দলের উপর বিচারহীন আস্থা — এই ভাবে ধাপে ধাপেই স্বৈরতন্ত্র এসে কাঁধে চড়ে বসে ...ধর্মসংস্থাপনার্থ! তাই রাজনীতি ব্যবসায়ীরা

যখন ধর্মের কথা বলে তখনই আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কিন্তু এই ইতিহাস যারা জানে তারাও যথাসময়ে বিপদের লক্ষণগুলি চিনে উঠতে পারে না প্রায়ই।

যাই হোক আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে ফিরে যাই। নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠবার জন্য পরিবারের প্রতি আনুগত্যের চর্চা করতে হয়, আবার পারিবারিক স্বার্থকে কিছুটা খর্ব করে পল্লীর প্রতি সৌহার্দের চর্চা করতে হয়। তারপরের পল্লীর প্রতি আনুগত্যেরও উর্দ্ধে উঠে বৃহত্তর দেশ বা রাজ্যকে ভালবাসতে এবং তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হয়। এসব তো পুরানো কথা। বহু আধুনিক দেশের মানুষই এইভাবে বৃহত্তর গোষ্ঠীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে শিখেছে। যা এখনও ভালো করে শেখা হয়নি সে হল জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিকতার চর্চা করা। উন্নত চিন্তাভাবনায় সক্ষম সব মানুষই জানেন যে এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রসারিত ও পরিণত হয়। ব্যক্তিগত ছোট ছোট স্বার্থকে, এমন কি স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি আনুগত্যকেও যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বলি দিতে শেখা দরকার, এটাও কিছু আর নতুন কথা নয়।

অথচ এত সব জেনে শুনেও অত্যন্ত অগ্রসর দেশের মানুষও এখন পর্যন্ত পুরানো অভ্যাস, পুরানো চিন্তাকে কাটিয়ে উঠে বিশ্বের মানুষের প্রতি শুভকামনার প্রমাণ যে প্রতিদিন দিচ্ছে না, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে, কখনও বা কোনো দূর দেশের সঙ্গেও স্বার্থের সংঘাতকে জিইয়েই রেখেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ইরাকে আমেরিকার সাম্প্রতিক আচরণ বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত নীতিহীনভাবে আঘাত করেছে। জোর যার মুলুক তার — বর্বর যুগের এই নীতি আজও আমরা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়ে কখন থাপ পিছিয়ে গিয়েছি। সাম্যবাদীরা জাতীয়তাবাদকে খর্ব করে আর্ন্তজাতিক শ্রমিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেওতো স্বপনেই মিলিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন বিশ্বপ্রেমিক ভাবুক যত বড় আদর্শের কথাই বলে থাকুন না কেন, কোনো দেশই এখনও এই ব্যাপারে আমাদের সামনে অনুকরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে পারছে না। ভিসা পাসপোর্ট ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি ইত্যাদি কাঁটাতার দিয়ে বিদেশীকে ঠেকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের এই আত্মকলহে জর্জর রাষ্ট্রে কসমোপলিট্যানিজমের চর্চা কে যে শুরু করবে, কি ভাবে করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

তবু আপৎকালেও — দুর্ভিক্ষে বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে — দূর দেশের অপরিচিত মানুষদের জন্যও যে অনেকখানি মানবিক সহানুভূতি ও সাহায্যের মনোভাব দেখা যায় এটাও প্রশংসার ব্যাপার বই কি। ইথিওপিয়া কি বসনিয়ার অনাহার — ক্লিষ্ট মানুষের জন্য দূর — দূরান্ত থেকে যখন স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আহার সামগ্রী পাঠায় কিংবা ফিলিপাইন দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে সারা বিশ্বের মানুষ উদ্বিগ্ন বোধ করে তখন বিশ্বজনীন সহানুভূতির সামান্য ঐ আভাসটুকুতেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাভরসার ক্ষীণ রেশ জেগে থাকে।

এই ভাবে আশা জাগিয়ে রাখেন কিছু অসাধারণ মানুষও। এ্যালবার্ট শোয়াইৎজার কিংবা মাদার টেরিজার মতো ব্যক্তিরা দেশের উর্দ্ধে উঠতে পেরে অনাদেরও অনুপ্রাণিত করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রিস্টান মিশনারীদের শতদোষের কথা শুনেও বলব যে বিশ্বমানবিকতার পরিচয় এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে যতখানি পাওয়া যায় ততখানি আর কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া যায় বলে তো মনে করতে পারছি না। মুমূর্ষুকে, কুষ্ঠ রোগীকে, পরিত্যক্ত উন্মাদিনীকে এরা যে ভাবে পথ থেকে তুলে আশ্রয় দিচ্ছেন, পরিচর্যা করছেন তেমন আর কে করছেন? তবু তাঁদের সম্বন্ধে কতৃত্ব বক্রোক্তি প্রায়ই শুনতে পাই।

এদেশে আমরা যারা পরিবারের গন্ডী থেকে বার হয়ে পল্লীর মঙ্গলটুকুও চিন্তা করতে পারি না, আবর্জনার গাড়ি চলে যাবার পর নিজের সংসার পরিষ্কার করে জঞ্জালের স্তূপটি অনায়াসে প্রতিবেশীর দুয়ারের সামনে রেখে আসি, আপৎকালীন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কালোবাজারি করি, শিশুদের খাদ্যে ও প্রাণদায়ী ওষুধে ভেজাল মেশাই — এই আমরাই কী করে এক ধাপে বিশ্বমানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব ভেবে পাই না। নেতারা পর্যন্ত পারিবারিক স্বার্থের উপরে উঠতে পারছেন না। এই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা থেকে একেবারে বিশ্বজনীন পরার্থপরতায় উত্তরণ সম্ভব? প্রথমে কি দেশের প্রতি, জাতির প্রতি একটা দায়িত্ববোধ জাগানো দরকার নয়? তারপর হয়ত রয়ে সয়ে ধাপে ধাপে কসমোপলিট্যানিজমের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এইবার আমি আমার প্রথম প্রশ্নে আসি। জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথের কাঁটা? জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ হিন্দুবাদ হয়ে ওঠে তবে তো কাঁটা হবেই। জাতীয়তার অর্থই যদি হয় হিন্দুতা তবে তাতে অহিন্দুর স্থান কোথায়? অবশ্য হিন্দুবাদীরা ঐ 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে বেশ ভেলকি খেলেন। সাধারণত হিন্দু বলতে তাঁরা সেই ধর্মসম্প্রদায়কে বোঝেন যাঁরা বেদপুরাণ গীতার শিক্ষার উপর তাদের জীবনাদর্শকে এবং বর্ণাশ্রমের উপর জীবনব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছেন। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে আস্থাও অধিকাংশ হিন্দুর সামান্য লক্ষণ। এই যদি হিন্দুর অভিধা হয় তবে শিখ ব্রিস্টান মুসলমান তো বটেই এমন কি জৈন ও বৌদ্ধদেরও

'হিন্দু' বলা যায় না। তখন হিন্দুবাদীদের পক্ষে এইসব অহিন্দুকে গেলাও কঠিন হয়ে পড়ে, ফেলাও অসম্ভব ঠেকে। তাই তাঁরা তখন কথার ফেরে ভোলাতে চান। বলেন, হিন্দুর অর্থ ভারতীয়, যেমন হিন্দুস্থান আর হিন্দুস্থানীর অর্থ ভারত এবং ভারতীয় মানবগোষ্ঠী অথবা ভাষা! এই দ্বিতীয় অভিধাই যদি নিতে হয় তবে তো ভারতে জন্মালেই হিন্দু হওয়া যায়! তাহলে আবার এমন একচোখামি কেন করা হয় যে একদল যেন জন্মসূত্রেই হিন্দু ও দেশপ্রেমিক আর অন্য একদলকে চেষ্টাচরিত্র করে স্বভাবচরিত্র পালটে দেশপ্রেম শিখে হিন্দু হতে হবে?

যাইহোক হিন্দুবাদীদের এই কূটনৈতিক উদারতার সুযোগ নিয়ে বলি যে ভারতীয় মাত্রই যদি হিন্দু হয় তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদও ভারতীয় সংহতির অন্তরায় নয়। তবু এই অর্থেও আমি উগ্র জাতীয়তাবাদকে বেশ ভয় করি এই কারণে যে যদি এই অহঙ্কারী জাতীয়তাবাদ স্বার্থোন্মাদ হয়ে ওঠে তাহলে সেটা ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হবেই এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায় হবে। এই জন্যই আমি "গরব সে বোলো হম হিন্দু হ্যাঁয়"-কে রণহুঙ্কার, অতএব ভয়াবহ জ্ঞান করি।

কিন্তু নম্র একটি জাতীয়তাবোধের খুব প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। কারণ ক্রমশ দূর থেকে দূরতর অনাত্মীয়কে ভালবাসার ক্ষমতা আয়ত্ত করা অত্যাবশ্যক। এই বোধের ভিতর দিয়ে, এই প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়েই ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা তার সম্প্রদায়কে, তার দেশকেও অতিক্রম করে বিশ্বমানবতাতে পৌঁছবার পথ করে নিতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, "যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়", সেখানে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কোনো স্থান নেই। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তো ঐ চিরন্তন মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই বরং ঐ মূল্যবোধেই তার উৎস। তাই ক্রমপ্রসারণের এই চেতনা আপন পরিণামের বেগেই বিশ্বমানবতায় গিয়ে মিলতে পারবে বলে আমার ধারণা এবং মিলতে পারলেই তার সার্থকতা। এই বোধের মূলে আছে স্বগৃহকে পিছনে ফেলে ক্রমাগত দূরকে, অনাত্মীয়কে আপন করার চেষ্টা। বিশেষত এই দেশে যার আয়তন ও বৈচিত্র্য প্রায় একটি মহাদেশের মতো। নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ধর্মকে আত্মস্থ করেই বিবর্তিত হবে যে জাতীয়তার বোধ তাকে তো অনেকান্তবাদী হতেই হবে।

এর পরে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনে হয় কঠিন হবে না। জাতীয়তাবাদকে যদি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অনিবার্যত জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই। জঙ্গী হতে হবেই কারণ গৃহযুদ্ধ ছাড়া, বলপ্রয়োগ ছাড়া অহিন্দুকে হিন্দু করে ফেলা কিংবা ভারতবর্ষ থেকে দূর করে দেওয়া বা নিঃশেষ করে ফেলাও তো সম্ভব হবে না। হিটলার যেমন করে ইহুদী সমস্যার সমাধান করেছিল। তবে বালাসাহেব দেওরস আর বাল ঠাকরের পক্ষে ঐ চূড়ান্ত সমাধানটা তত সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি মহরম উপলক্ষে পাড়ার মসজিদ থেকে এক রাত্রে ধর্মীয় আলোচনা সভায় একজনকে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে শোনা গেল

"ছাড়ব না কোরান,
না ছাড়ব হিন্দুস্তান।"

জোর করে ছাড়াতে গেলে সে পথে গুপ্ত ঘাতকরা মারাত্মক মারণাস্ত্র বিছিয়ে রাখবেই। এই ভাবে সারা দেশটা রণক্ষেত্র হয়ে যাবে। এমন বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করার পরেও কি আমরা অন্যপথের সন্ধান করব না?

ভারতীয় রাজনীতিকে হিন্দুবাদী করা আর হিন্দুবাদকে জঙ্গীবাদ করে তোলা যদি বা একজন সংকীর্ণচেতা, দূরদৃষ্টিহীন, আতুহননে উৎসুক নেতার স্বপ্নবিলাস এবং আমরণ প্রয়াস ছিল তবু তা ব্যর্থ হবে বলেই আমার ধারণা। কারণ আমার রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশি বলেই আমি তাঁর উপরে আস্থা রাখি:

"বর্তমান কালে হিন্দুয়ানীর পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

"কিন্তু এ ধূলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে — সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।" (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

বিবিধের মাঝে মহান মিলনের ভাবনা কি শুধুই আত্মছলনা, কেবলই আলেয়া? সেই মহৎ সম্ভাবনা এখনও অনেকটা অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে বটে। কিন্তু এই দিক্‌ভ্রান্ত, দেশকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাবার মত বড় মাপের দিশারী কি সত্যিই দেখা দেবে না? তবে কি সেই চিরন্তন বাণীই আজকেও প্রতিটি ভারতবাসীকে পথ দেখাবে: আত্মদীপঃ ভব! যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আত্মদীপ হতেই হয়। আর এহেন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ চোখে ঠুলি পরাতে পারবে?

ঝড়ঝঞ্ঝা

শুভমানস ঘোষ

সন্ধের মুখোমুখি একটা ঘটনা ঘটে গেল। এই রকমের কোনও শীতের দিনে এমন বড় একটা ঘটে না। আকাশ ঢেকে গেল মেঘে। ন্যুকে আটকানো কাঁচের শার্সি শিউরে উঠল। দমকা বাতাস হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। দেওয়ালে ঝুলছিল ক্যালেন্ডার। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উল্টে গেল সেটা। মুহূর্তে ঘাসমাটি উড়িয়ে আনা বাতাস গুলির মতো সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ক্যালেন্ডারটাকে তখন ধনুক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও মানুষের মতো লাগছিল অবিকল। দেওয়ালে মুখ গুঁজে সিঁটিয়ে আছে একেবারে।

এই ঘরে কয়েকজন ছিল। হালকা মেজাজে কথাবার্তা হচ্ছিল তাদের মধ্যে।এক্ষুনি এই রকমের কোনও ঘটনা ঘটে যাবে ভাবেনি কেউ। সচকিত হয়ে উঠল সকলেই। দীপ তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল জানালা বন্ধ করতে। ফের ডিপ্রেসন হল কিনা সে নিয়ে সে বিরক্তি মেশানো সন্দেহ প্রকাশ করছিল। মধ্য তিরিশের যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক ডিপ্রেসনকে পছন্দ করে না বোধ হয়।

দীপের স্ত্রী রিনি একটু নার্ভাস প্রকৃতির। এই ঘটনায় ভারি বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কিছুতেই সে তার আঁচল সামলাতে পারছিল না। তার সর্বাঙ্গে ঢেউয়ের মতো খেলে বেড়াচ্ছিল হাওয়া। চেঁচিয়ে বার বার দীপকে বলছিল, এই বন্ধ করো না জানলা।

জানালা বন্ধ করতে অসুবিধে হচ্ছিল দীপের। হাওয়ার এমন তোড়, তাকে বুজিয়ে রাখতে হয়েছিল চোখ। দুটো জানালার চারটে হুক। তার মতো স্বাস্থ্যবান যুবকেরও সময় লেগে গেল কিছুটা। তার মধ্যেই কিচকিচে বালিতে তার মুখচোখ ভরে গিয়েছে। চোখের ওপর লতিয়ে নেবে এসেছে দলছুট গোছা চুল। বোধ হয় নিম্নচাপের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটা গালাগালি ছুঁড়ে ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিল সিগারেট।

হাওয়ায় বিস্তর ঘায়েল হয়েছিল শুভমরাও। পকেট থেকে রুমাল বের করে শুভম চোখের কোলের ধুলো মুছে নিচ্ছিল। রোগাই বলা যায় ওকে। তবে মুখচোখে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে। সেই সঙ্গে একটা নিরীহ অসহায়তাও। খুব সম্ভব এই দুটো পরস্পরবিরোধী ভাবকে মেলানোর উদ্দেশ্যেই ও কথায় কথায় হাসে। অবশ্যই সেই হাসি সশব্দ হয় না বড় একটা। এই যেমন এখন। ঠোঁটের ওপর পাতলা হাসি একটুকরো। তাকিয়ে রয়েছে দীপের দিকে। বলছে, বড্ড বেরসিক তো তোদের পাড়াটা। কথা নেই বার্তা নেই, ঝড়! মানে হয়?

কোনও কথা বলল না দীপ। ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ফের এসে বসল সোফায়। একটু হেসে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ও বুঝেছে এটা প্লেন জোক্।

এই সময় প্রমিতা তাকাল শুভমের দিকে। মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে মস্ত লাগছিল চোখ দুটো তার। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য— অন্তত ব্যক্তিত্বময়ী লাগে প্রমিতাকে। এখন একটা হালকা চিন্তার ছাপ ওর মুখে। জানালার দিকে চেয়ে বলে উঠল শুভমকে, বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। বাড়ি ফিরবে কী করে? বেরিয়ে পড়লে হয় না?

দপ্ দপ্ করে উঠল দীপের সিগারেট। তাকাল প্রমিতার দিকে। ফোয়ারার মতো সরলপথে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ভাববেন না, আমার কার আছে।

প্রমিতার চোখ ঘুরে গিয়েছিল দীপের দিকে। না জানি কেন এই মানুষটাকে কিছুতে ভাল লাগছে না ওর। বার বার মনে হচ্ছিল, এমন কেউ শুভমের বন্ধু হয় কী করে? গাড়িকে কার বলে সম্ভবত ও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, টাকা জিনিষটা বড় সহজে পাওয়া হয়ে গিয়েছে ওর।

যাওয়ার কথা উঠতে রিনি খুব গোলমাল করে উঠল। যেন এজন্যে সে-ই দায়ী হয়ে থাকবে এমনই ভাব করে দ্রুত অনেক কথা বলে গেল সে। একটাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে প্রথমেই বৃষ্টি হবে না বলে ভরসা দিল। তারপর শুভমরা একেবারে

রাত্তের খাওয়া সেরে না গেলে দুঃখ পাবে বলল। তারপর আর একটা কী বলবে বলে শুরু করেছে সবে, জানালার ওপর চড়বড়িয়ে উঠল বৃষ্টির ফোঁটা। অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল সে।

মেয়েটা মন্দ নয়। মনে হচ্ছিল প্রমিতার। এইসব মেয়েদের নিয়ে একটাই মুশকিল। মৌলিকতার বড়ই অভাব। পুরুষের ইচ্ছের জমির ওপর নিজীব হয়ে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। এইতো মাত্র এক ঘণ্টা হল তারা এসেছে এখানে। এর মধ্যে বেচারিকে বার তিনেক স্বামীর ধমক খেতে শুনল। কথা হচ্ছিল শুভমের বিয়েতে না যেতে পারা নিয়ে। গম্ভীর ভাবে দীপ বলছিল, আর বলিস না। আর একটা ভেঙ্কার হাতে নিয়েছি। তাই নিয়ে শালা হ্যান অফিস আন অফিস—

এই সময় রিনি হঠাৎ বলে উঠেছিল, আমার কিন্তু যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল শুভদা।

মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল দীপ। ঠোঁট দিয়ে শব্দ করে ভারি এক দৃষ্টিকটু ভঙ্গিতে ধমকে উঠেছিল, যেখানে সেখানে ফ্যাচ ফ্যাচ করো কেন? একজনের সঙ্গে কথা বলছি না?

তখনই প্রমিতার মনে হয়েছিল দ্বিতীয়বার এই বাড়িতে তার আসতে ইচ্ছে হবে না। একটা ক্ষোভের আগুনে গোলা তার ভেতরে ঘুরপাক করতে শুরু করেছিল। এই সব বন্ধুবান্ধব শুভমের? আজ বাড়ি ফিরে খুব কড়া করে ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে সেই ইংরেজি প্রবাদটার কথা যাতে বন্ধুদের দেখে মানুষের চরিত্র বুঝে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সে কথা শুনে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে শুভমের? সেটাও ভাবতে চেষ্টা করেছিল প্রমিতা। দেখতে পেয়েছিল একটা ছবি। ডোপিং টেস্টে ধরা পড়ায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে সোনা। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে অ্যাথলিট। ভারি একটা তৃপ্তি অনুভব করেছিল প্রমিতা।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল প্রমিতা। কিন্তু রিনির দিকে চেয়ে সেটা কেটে গেল তখনই। এইমাত্র ধমক খেয়েছে তবু চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে রিনি তখন ওকে বোঝাতে চাইছিল তার কর্তাটি বড়ই কড়া এবং তার জন্যে তার অভিযোগ নেই কোনও। এই সময় হেসে ফেলতে পারত প্রমিতা। কিন্তু তার বদলে আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল সে। রিনির নির্বোধ অসহায়তা ছুঁয়ে ফেলেছিল তাকে।

ওদিকে খুব জমে গিয়েছিল শুভম। একাই বকে চলেছিল। এই দীপ লোকটি তার ছোটবেলার বন্ধু। স্কুলে পাশাপাশি বসত। ক্লাসে গোলমাল করার জন্যে 'ফেমাস' ছিল। মাথা খাটিয়ে প্ল্যান বের করত শুভম। দীপ বাস্তবায়িত করত সেটা। ছোটবেলা থেকেই হাট্টাগোট্টা চেহারা ছিল দীপের। মাস্টার-মশাইরাও সমঝে চলতেন ওকে। তবে পড়াশোনায় তেমন সুবিধের ছিল না। তার জন্যে তাকে নির্ভর করতে হত শুভমের ওপর। পরীক্ষার হলে বরাবরই শুভমের পাশের জায়গাটা ছিল ওর। এই করে অবশ্যি বেশি দূর এগোতে পারেনি। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কোনও রকমে উতরে গেলেও কলেজে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। শুভম ওকে পেরিয়ে চলে গেল।

কথা হচ্ছিল স্কুলের শেষ পরীক্ষা নিয়ে। উৎসাহের সঙ্গে শুভম বলে যাচ্ছিল পরীক্ষার নজরদার মাস্টারমশায়ের কথা। বারবার দীপের দিকে নজর ছুঁড়ে বলছিল প্রমিতাকে, দীপের চেহারা দেখে স্যারের তো হয়ে গেছে। 'ওরে বই দেখে লিখিস না, চাকরি পাবি না' বলে স্লাইট উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরে গিয়ে চুলতে লাগলেন।

প্রমিতার দুই ভুরুর মধ্যে চমকে উঠল জিজ্ঞাসা। ও জানতে চাইছিল ঘটনাটা সত্যি কিনা। তাই শুনে এই প্রথম দাঁত বেরিয়ে পড়ল দীপের। শুভমের দিকে ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়ে ফিরল প্রমিতার দিকে, আপনি বোধ হয় কখনও করেননি এসব?

— না। — ওর গাল ঠেলে ফুটে উঠল দাঁতের চাপ। চলকে উঠল রক্ত।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল দীপ। সিগারেটের জন্যে পকেট হাঁটকাচ্ছিল। এই সময় যেন জোর করে সশব্দে হেসে উঠল শুভম। হাসল আর বলল প্রমিতাকে, তুমি একটা কী? এতে রাগ করার কী হল?

ঠিক এই জিনিষটা পছন্দ করে না প্রমিতা। এই সবে তিন মাস হল বিয়ে হয়েছে ওদের। তার মধ্যে বেশ কয়েকবার দুজনের গোলমাল হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে। প্রমিতার বক্তব্য ছিল, ওর নিজের যে মূল্যবোধ সেটাকে ছোট করার কোনও অধিকার শুভমের নেই। ও লক্ষ্য করে দেখেছে এর আগে কোনও প্রসঙ্গে যখনই তার কোনও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছে ও, হেসে উঠেছে শুভম। তারপর অবধারিতভাবে বলেছে তাকে, তুমি ব্যাপারটা ওভাবে নিচ্ছ কেন?

প্রথম প্রথম অপ্রস্তুত হয়ে যেত প্রমিতা। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে এসব কথা-ঘোরানোর কৌশল। প্রমিতার মূল্যবোধ যাতে গুরুত্ব না পায় তার একটা সূক্ষ্ম ছল মাত্র। এইরকম এক অবস্থায় গুরুদেবের কথা মনে পড়ে যায় প্রমিতার। তিনি বলতেন ইষ্ট ও আদর্শের সঙ্গে আপস করবে না কখনও। ক্ষণিকের সুখের আশায় শ্রেয় ও প্রেয়কে এক করে ফেলোনা। মনে রেখো ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ইষ্ট ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নাহলে কোন্‌টা ধর্ম আর কোন্‌টা অধর্ম চিনবে কী করে মা?

গুরুদেব অনেক কিছু শিখিয়েছেন প্রমিতাকে। ছোটবেলা থেকে তাঁর সান্নিধ্যেই বলা যায় বড় হয়েছে সে। বছরে দুবার তিনি আসতেন তাদের বাড়ি। গ্রীষ্মে ও শীতে। দিন সাতেকের মতো থাকতেন। ঠাকুরঘরের মেঝেতে কম্বল পেতে বসে মৃদুস্বরে কথা বলে যেতেন। একটু করে বলতেন আর চোখ দুটো বুজিয়ে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিতেন। তারপর নিঃশ্বাসের বাতাসে সাদা দাড়ি কাঁপিয়ে ফের শুরু করতেন। যতক্ষণ কথা বলতেন প্রমিতার বাবা তাঁর সামনে বসে থাকতেন বুকে হাত জড়ো করে। বড় অল্প বয়সে বিপত্নীক মানুষটার চোখের কোলে তখন চিকচিক করত আলো। তাই দেখে প্রমিতার কচি বুকের ভেতর কী যেন হয়ে যেত একটা। বিস্ময়, ভয় আর ভাললাগা মাখামাখি এক অদ্ভুত অনুভূতি। তাইতে একেবারে বুঁদ হয়ে যেত ও। ছটফটে হাত পা আপনাআপনি শান্ত হয়ে আসত। হাঁ করে চেয়ে থাকত গুরুদেবের মুখের দিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করত তাঁর কথাগুলো। গুরুদেব এই পৃথিবীর ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালার কথা বলতেন। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কিছুতে বুঝতে পারত না কথাটা। অথচ জানতে চাইলে গুরুদেব কী ভাববেন এই ভেবে প্রশ্নও করত না। কেননা তিনি একাধিকবার প্রমিতাকে বলেছেন যে তার ভেতরে তিনি অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। সে নাকি সাধারণ মেয়ে নয়।

একটু বড় হয়ে অবশ্যি সবই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল প্রমিতার কাছে। সেই দিনটায় সব চেয়ে বেশি করে যেদিন ছোটবোনের বইয়ের মধ্যে পেয়ে গেল একটা চিঠি। তখন প্রমিতা সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। গুরুদেবের কথার মানে বুঝতে শিখছে একটু একটু করে। তখনকার ঘটনা। কেন জানেনা, দপ্ করে মাথার ভেতরে তার জ্বলে উঠেছিল আগুন। একটা তেরো বছরের মেয়ের কাছে এমন চিঠি আসবে কেন — এই একটা প্রশ্ন বিষাক্ত কীটের মতো তার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল একটা জ্বালাধরানো অস্বাচ্ছন্দ্য। ধরা পড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল সুমি। মুখের ডানার মতো চোখের মধ্যে কাঁপছিল ভয়। সেই সময় প্রমিতার ভেতর ভয়কের একটা ইচ্ছা ডালপালা ছড়াচ্ছিল। সুমি বলে এই মেয়েটা মরে যাক এখনই। সজোরে ওর গালে চড় কষিয়ে দিয়েছিল একটা। তারপর বাবার সম্মান, পরিবারের সম্মান, এইসবের পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে সেই নিয়ে বিস্তর কথা বলে যেতে হল তাকে। অথচ সেই দিনই রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতে ঘুম এল না প্রমিতার। গুরুদেব ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালার কথা বলেন। খুব করে মনে আসছিল তা। সেই সময় একটা বিষণ্ণ ছবি তার মাথার ভেতর দপ্ দপ্ করে উঠছিল বার বার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের প্যালেস্তারা খসিয়ে নৌকা চলেছে। এই অন্ধকার ফুরবে না কখনও। নৌকাও থামবে না কখনও — চলতে থাকবে শুধুই। গুরুদেব অনাদি অনন্ত নিরাকার পরম ব্রহ্মের কথা বলেন। তিনি কি ওই নৌকার মাঝির মতো? ওই রকমের নিঃসঙ্গ, নির্জন? প্রলয়ংকর অন্ধকার ভেদ করে যিনি কেবলই চলে চলেছেন? বুকের ভেতরে এক নিদারুণ মনখারাপ করা অনুভূতি কুরে কুরে খাচ্ছিল প্রমিতাকে।

॥ ২ ॥

বেশ রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। রিনি না খাইয়ে ছাড়ল না কিছুতেই। দীপের ইচ্ছা ছিল কারে করে পৌঁছে দেয় ওদের। কিন্তু প্রমিতা হতে দিল না সেটা। অনেকক্ষণ এই লোকটার কাছাকাছি থাকতে হয়েছে। আর সহ্য হল না। পরিষ্কার বলে দিল, কোনও দরকার নেই গাড়ির। আমরা চলে যাব ঠিক।

বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলেছিল প্রমিতা। থমকে গেল দীপ। তারপর দ্রুত প্রমিতার চোখ থেকে নজর সরিয়ে উদ্ভতভাবে ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিল সিগারেট। ব্যাপারটা ভাল লাগল না শুভমের। তাড়াতাড়ি বলল, যা খাইয়েছিস একটু হাঁটাহাঁটি না করলে হজম হবে না। তুই কিছু মনে করিস না দীপু।

ঝটিতি শুভমের দিকে চাইল প্রমিতা। এত কৈফিয়তের কী আছে? তিন ঘণ্টা হয়ে গেল ওরা এসেছে এখানে। তার মধ্যে কখনও দেখল না দীপের সঙ্গে তার বন্ধুর মতের অমিল হল একবারও। এইতো পরীক্ষায় বই খুলে লেখা নিয়ে কথা হচ্ছিল

তখন। প্রমিতা যেই প্রতিবাদ করল, বন্ধুকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভম। সেই পরিচিত কৌশল। হাসি দিয়ে শুরু। তারপর তার গিন্নিটি কতটা অর্থোডক্স, সকাল সন্ধ্যা কীসব জপ-টপ করে, ঈশ্বর ভগবান ধর্ম-কর্ম নিয়ে কতসব কথা জানে, একটুও বেচাল সহ্য করতে পারে না— এইসব বলে সমস্ত ব্যাপারটাকে আড্ডার খোরাক করে তুলল। শুভম ভারি সুন্দর করে বলতে পারে। আবার সে সব যখন তারই কথা তখন মধ্যে মধ্যে 'চুপ করো তো' বলা বই আর কী করার ছিল। অবশ্যি সে সময় রিনিকে দেখে ভারি মজা লাগছিল প্রমিতার। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। শুভমের কথার ফাঁকে ফাঁকে তাকাচ্ছিল প্রমিতার দিকে। বিস্ময়কর কিছু দেখছে যেন। চোখ বড় বড় করে বারবার বলছিল, ওমা তাই নাকি?

সেই সময় আড় চোখে দীপকে একবার দেখে নিয়েছিল প্রমিতা। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে আত্মগোপন করে রেহাই পেতে চাইছে যেন। দৃশ্যটা বড়ই তৃপ্তিকর। এই মানুষটার জানা দরকার, গাড়ি, বাড়ি আর টাকাকড়ির বাইরেও একটা দুনিয়া আছে।

তারপরেই ঝড় এসে পড়ল। ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল রাস্তার রাহীদের দুদ্দাড় করে ছুটে চলে যাওয়ার শব্দ। সামনের একতলা বাড়ির মাথার আকাশটা ধুলোয় ঘোলাটে হয়ে এসেছিল। তারপরেই হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল বৃষ্টি। তবু ঝড় থামছিল না। সাপুড়ের বজ্রমুষ্টিতে ধরা পড়া ঋরিসের মতো পাকিয়ে উঠছিল তার লেজ। মধ্যে মধ্যে গোঁ গোঁ ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শার্সির ওপর। সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল চিড়বিড়ে অসংখ্য ধুলোর টুকরো। কেঁপে কেঁপে উঠছিল জানালা।

এই সময় দীপ ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসে কথা বলে উঠেছিল। প্রমিতার দিকে দ্রুত নজর ছুঁইয়ে চলে এসেছিল শুভমের মুখের ওপর, চলবে নাকি?

মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল ঘরের আবহাওয়া। ত্রস্ত ভঙ্গিতে শুভম একবার প্রমিতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পা বদলে বসেছিল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ওদিকে রিনির চোখে ফুটে উঠেছে ভয়। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলে উঠেছে, না না, এখন ওসব নয়। গল্প করছিলে করো না।

দীপ ফিরেও তাকাল না রিনির দিকে। ফের বলল শুভমকে, তোর চলে তো এখনও? নাকি সাধু সন্ন্যাসী বউয়ের পাল্লায় পড়ে পাট চুকিয়ে দিয়েছিস?

অসংলগ্নভাবে শুভম উত্তর দিল, না মানে — এখন ঠিক ইচ্ছে হচ্ছে না। পরে কখনও —

হা হা করে হেসে উঠল দীপ। তারপর প্রমিতার দিকে চেয়ে বলে উঠল পরিষ্কার গলায়, আমার বন্ধুটিকে মানুষ করে দিয়েছেন। আপনার ক্রেডিট আছে বলতে হবে।

তখনও যেন ব্যাপারটা বোঝেনি এমন ভাব করছিল প্রমিতা। ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? কীসের ক্রেডিট দিচ্ছেন আমায়?

—সে কী? বোঝেন নি এখনও? —একবারও চোখ না সরিয়ে বলে যাচ্ছিল দীপ, থাক্, বোঝেন নি যখন না বলাই ভাল। কানে আঙুল দিতে হবে আবার।

এই সময় খুব জোরে শব্দ উঠল কাঁচের শার্সির ওপর। বৃষ্টির ওপর তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ছিল ঝড়। ঘাড় ঘুরিয়ে জানালার দিকে একবার চেয়ে নিল প্রমিতা। তারপর তাকাল দীপের দিকে। আগুনে গোলাটা উঠে এসেছে চোখে। বলছিল কেটে কেটে, আপনি এভাবে আমাকে ইন্সাল্ট করতে পারেন না। যা বলার পরিষ্কার করে বললে খুশি হব।

ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি শুভম বলে উঠল, প্রমি, তোমার রাগ করার কোনও মানে হয় না। দীপু তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। টেক ইট ইজি।

এই সিগারেটটাও শেষ হল না। এ্যাশট্রেতে চেপ্টে দিচ্ছিল দীপ টুকরোটা। মনে হচ্ছিল ঘাড় ভেঙে কাউকে গুঁজে দিচ্ছে নর্দমায়। কোনও বাস্ততা নেই, ধীরে ধীরে বলছিল প্রমিতাকে, কিছু মনে করবেন না। আমি একটু কাঁচাখোট্টা লোক। দুমদাম যা খুশি বলে দি। মেয়েদের মন যুগিয়ে চলতে পারি না। এখন না হয় ভদ্রলোক হয়েছি, একসময় মস্তানগুণ্ডা ছিলাম কিনা।

এটা একটা ভাল সুযোগ হয়ে গেল শুভমের। দীপের মস্তান জীবনের কাহিনী সবিস্তারে বলতে শুরু করল। এইবার প্রমিতা বুঝতে পারছে সব। শুভমের ক্রমাগত পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। লেজ খসে যাওয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সাপকেও ভয় পায় সকলে। শুভমও। বড়ই দুর্বল চরিত্রের বলে বোধ হয় একটু বেশিই পায়। মুহূর্তে প্রমিতার মনটা গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই ভারি দৃষ্টিকটু ঠেকছিল ওর। যে উৎসাহের সঙ্গে শুভম তার বন্ধুর ইতিহাস ঘাঁটছে তাকে কেন জানি না, মুদ্দোফরাসের মতো মনে হচ্ছিল ওর। কুষ্ঠরোগীর মতো তার

সমস্ত শরীর থেকে খসে খসে পড়ছিল দীনতা। এই সময় গুরুদেবের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রমিতার। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ। গুরুদেবের কাছে এই শ্লোকটার একটা নতুন রকম ব্যাখ্যা ছিল। এই ধর্ম মন্দির-মসজিদের ধর্ম নয়, ভাগবত ধর্ম। এই ধর্ম পশুর নয়, কেবলমাত্র মানুষের। যে মানুষ সেই পথে না গিয়ে পরধর্মে নিরত হয় সে পশুই হয়ে যায়। উৎপীড়িত কুকুর দু পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে পালায়। সেই মানুষের অবস্থাও হয় অবিকল তাই। শুভমের দিকে চেয়ে সেটা বুঝে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল না প্রমিতার।

ঝড়ের আক্রোশ কমে এসেছিল। এইবার ঝেঁপে এসেছে বৃষ্টি। শার্সির ওপর বৃষ্টি-বিন্দু গড়ানোর দাগ ফুটে উঠছিল বার বার। কোনও দাগই থাকছিল না বেশিক্ষণ। অনা বৃষ্টি-বিন্দু ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোমেলো করে দিচ্ছিল তাকে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। রিনি আলো জ্বালিয়ে দিল। তখনও শুভমের কথা শেষ হয় নি।

কিছুই ভাল লাগছিল না প্রমিতার। বাইরে দিন ফুরল না অথচ ঘরে আলো জ্বলে গেল। এইটা বোধ হয় দ্রুত বাড়িয়ে তুলছিল তার বিষণ্ণতা। কেমন যেন হয়ে গেল জীবনটা। মনে হচ্ছিল ওর। এই নগদত্তহীন মানুষটার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে তাকে? মাত্র তিন মাসের ঘর সংসার। তার মধ্যে কিছু কিছু আন্দাজ করলেও কোনও একটা মানুষ সম্পর্কে পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পক্ষে সময়টা যথেষ্ট ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, আজকের মতো এতটা নগ্নভাবে আগে শুভমকে দেখা হয়নি তার। তাই বুঝি এখানে আসার আগে পর্যন্ত একটু অন্যরকমভাবে দেখছিল সমস্ত ব্যাপারটা। ওর একটা ধারণা ছিল, শুভমকে সে তার নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবে। আজ হাসলেও একদিন মানবজীবনের চরম সত্য সম্পর্কে তার কপালে ভাঁজ পড়বে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তার ভেতরেও চারিয়ে যাবে। গুরুদেব বলতেন অজ্ঞানরের চোখে চোখ পড়ার আগে পর্যন্ত যত ছটফটানি হরিণছানার। তারপর আর নড়াচড়া নেই। শুভমও একদিন এই রকম হবে। মনে হত প্রমিতার। এই বিশ্বাসের বশেই শ্বশুরবাড়ির বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের মধ্যে সে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে গিয়েছিল। অবশ্যি কাজটা কঠিন ছিল না বড় একটা। কেননা শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই মাটির মানুষ। বিয়ের পর এসে প্রমিতা দেখত শাশুড়ী একটানা বক বক করে যাচ্ছে ঘর সংসারের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। আর ভাল মানুষ শ্বশুর পরম উৎসাহে কান পেতে শুনছে সব। আত্মীয়স্বজনের কথা, খাওয়া দাওয়ার কথা— এইসব অতি সামান্য বিষয়ে তাদের এতটা আগ্রহ দেখে ভাল লাগত না প্রমিতার। বিশেষ করে ভাল মানুষ শ্বশুরের প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে যেত তার। এই মানুষটা এতকাল পৃথিবীতে রইল, কিছু বুঝল না। চেষ্টাও করল না বোঝার। মানবজীবনের পরমার্থ সম্পর্কে একেবারে ফেল করা ছাত্রের মতো অসহায় থেকে গেল। তবে শুভম সম্পর্কে বোধটা ছিল একটু আলাদা। সে যেন ফাঁকিবাজ ছাত্র। বুদ্ধি আছে যথেষ্ট, কিন্তু পড়া করে না। পড়ার কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। ঠিক এই জিনিষটা পছন্দ ছিল না প্রমিতার। প্রথম দিকে বিস্তর অশান্তি হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে। সকাল সন্ধে জপ করে প্রমিতা। তাই দেখে হেসে অস্থির শুভম। তখন গম্ভীরভাবে বিষয়টা বোঝাতে চাইছে প্রমিতা, তাও শুনবে না। ঠাট্টা করে যাবে খালি। মুশকিল হয়েছে এটাই। প্রমিতা যত সিরিয়াস সে তত লঘু। কিছুতে আর ঝগড়া পাকিয়ে ওঠে না। অতএব চূড়ান্ত কিছু করে ফেলতে জোর পায় না প্রমিতা। এর চেয়েও একটা বড় বাধা হল, এই কদিনে সে ভালই বুঝেছে যে শুভম ছেলেটা চোখে পড়ার মতো আলাদা রকমের। পরের উপকার করতে বড়ই উৎসাহ তার। এই পরের তালিকায় মানুষ থেকে মনুষ্যেতর কেউ বাদ নেই। রাজ্যের কুকুর বেড়াল দৈনিক পাত পাড়ে বাড়িতে। ভোরে উঠে নিজের হাতে কাকেদের ব্রেকফাস্ট করায় সে। চড়ুইপাখির জন্যে ছড়িয়ে দেয় আটার গোলা। ওদিকে পাড়ার কে যেন মারা গিয়েছে। সদ্য বিবাহোত্তর একটা রাত কাবার করে এল শ্মশানে। এর ওপর আছে চারিটেবল ডিসপেন্সারি, রাত জেগে পাড়া পাহারা দেওয়া, এর তার কাজে যখন তখন বেরিয়ে পড়া। সবে বিয়ে হওয়া যে কোনও স্ত্রীর পক্ষে এইসব মেনে নেওয়া কষ্টকর। কিন্তু প্রমিতা ব্যাপারটা সেভাবে নেয়নি। ওর মনে হয়েছিল আর্তের সেবা যথেষ্ট উন্নত ধরনের কাজ। স্ত্রী হিসাবে তার উচিত তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। কিন্তু এর পাশাপাশি একটা প্রশ্নও তার মনের ভেতর জাগত যে, শুভম এই মূল্যবোধ পেল কোথায়? আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছাড়া চট করে তো এই জিনিষ আসে না। অথচ শুভমের মধ্যে তার বাষ্পমাত্র দেখা যায় না। তবে? বেশিদিন তো থাকা যায় না শুনো। তাই দিন কয়েক পরেই এই প্রশ্নের একটা জবাব গড়ে নিতে হয়েছিল প্রমিতাকে। ও নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছিল, জন্মান্তরের কৃতকর্মই শুভমকে এই বোধে পৌঁছে দিয়েছে। গুরুদেব যেমন বলেন, ওর 'আধারটা' ভাল। খেলনা পেলে বাচ্চা যেমন

ভুলে যায় মাকে, তেমনি ভুলে আছে সমস্ত। খিদে পেলেই কেঁদে উঠবে ঠিক।

এই বিশ্বাস শুভমের সমস্ত প্রগল্‌ভতা ভুলিয়ে দিচ্ছিল প্রমিতাকে। অবশ্যি এই সময় শরীরটাও একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ওর প্রতিবাদের সূচিমুখগুলোকে কেমন যেন ভোঁতা করে দিচ্ছিল। ছোটবেলা থেকে শরীরের খুশিকে শ্রদ্ধার চেখে দেখেনি সে। ওটা একটা নাছোড়বান্দা ক্ষুধার্ত মাংসপিণ্ড বই না। তাড়না দিয়ে বশে রাখতে হয়। এই ছিল ধারণা তার। তাই বিয়ের পর পর শুভমের হ্যাংলামি দেখে রাগ হত। করুণাও হত সেইসঙ্গে। এই মানুষগুলো শরীরের কী অসহায় শিকার! যেন আর্তের সেবা করছে এইভাবে দেহদান করত। প্রমিতা লক্ষ্য করে দেখেছে তাইতে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত শুভম। ভীরু কাঠবেড়ালীর মতো লঘু পায়ের ছোট্ট ছোট্ট লাফে তার শরীরের কোটরে ঢুকে পড়ত। এইটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। ভুলিয়ে দিচ্ছিল শুভমের সমস্ত অপূর্ণতা। একটু একটু করে বোধ হয় সে ভালও বাসতে শুরু করেছিল তাকে। কিন্তু তারপরেই এই।

॥ ৩ ॥

ঝড় থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টিটা থামতে চাইছিল না। কিছুক্ষণ হল থেমেছে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে বোঝবার উপায় ছিল না। আশপাশের বাড়ির ছাদের নল দিয়ে এখনও তোড়ের সঙ্গে জল বেরচ্ছে। ছাদ থেকে, সিলিং থেকে টুপ টাপ জল পড়ছে অবিশ্রাম। পিচের রাস্তায় মধ্যে মধ্যে ডুবে যাচ্ছে গোড়ালি। বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো বিনবিনিয়ে উঠছিল প্রমিতার মুখের ওপর।

বিরক্ত হচ্ছিল শুভম। প্রমিতা আজ বাড়াবাড়ি করে ফেলল। দীপুকে সে পছন্দ করছে না তা অতটা দৃষ্টিকটুভাবে বুঝিয়ে না দিলে হত না? তাছাড়া সে দীপুর কতটুকুই বা জেনেছে? বি.এ. পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপের টাকা জোগাড় করতে পারছিল না শুভম। নিজে জীবনে বি.এ. পাশ করতে পারবে না জেনেও জোর করে দীপু তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল টাকা। তারপরে এ্যাপেন্ডিসাইটিসের সময়ও দীপুই এসে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। তখন —

— তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি।

কথাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ তার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে প্রমিতাকে। উদ্ধত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। যেন রাস্তার কোনও লোফারের সঙ্গে কথা বলছে। বিশ্রী লাগল শুভমের। পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়ল সে-ও। কী বলবে জানা আছে, তবু চুপ করে শুনতে লাগল প্রমিতা বলছে, এইসব বাজে লোকের বাড়ি যাওয়ার কথা আমাকে আর বলবে না।

পথের আলোয় বৃষ্টিভেজা চকচকে রাস্তার দিকে চেয়েছিল শুভম। কোনও কথা বলল না। তাইতে আরও রাগ হয়ে গেল প্রমিতার। দাঁড়িয়ে পড়ে মুখোমুখি একেবারে শুভমের — কথা বলছ না যে?

— কী বলব? — হাসি ফুটে উঠল শুভমের মুখে। ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু হাসল।

— আমি জানি কিছুই বলার নেই তোমার। — প্রমিতা বলছিল। চুঁইয়ে পড়ছিল অসীম বিরক্তি তার কণ্ঠস্বরে — ওই বাজে লোকটা তোমার বন্ধু হল কী করে?

বড় দুর্বল জায়গায় হাত পড়ছে। তবু হাসিটাকে মরে যেতে দিল না শুভম। বলল, দীপুকে বাজে লোক বলছ? যাঃ!

চেঁচিয়ে উঠল প্রমিতা, বাজে মানে লম্পট একটা।

বলল বটে, অনেক কিছু যেন বলা হল না। মনে হল প্রমিতার। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে লোকটাকে যতটুকু দেখেছে তার সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আরও কঠোর ভাষায় দীর্ঘসময় ধরে বললেও যেন ফুরবে না কথা। ফুলে ফুলে উঠছিল প্রমিতার বুক। এই প্রথম কোনও পুরুষ তার ভেতরটা এইভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত একটা ঘৃণা মেশানো আকর্ষণ তার ভেতর থেকে আক্রোশ হয়ে ফুটে বেরচ্ছিল।

— ছিঃ প্রমি, এ সব কী বলছ তুমি?

— আমি ঠিকই বলেছি। আবার বলছি লোকটা লম্পট। লোকটা অসভ্য। কুৎসিত। লোকটা —

চুপ করে গেল শুভম। আর একটাও কথা বলল না। ট্যাক্সি যাচ্ছিল একটা। দাঁড়িয়ে পড়ল হাত তুলে।

মিনিট দশেকের মধ্যে এসে পড়ল বাড়ি। ততক্ষণে একটা বিশেষ কথা ভাবা হয়ে গিয়েছে প্রমিতার। সবটাই একটা বিজনেস। আধ্যাত্মিকতার চোরা টান বলে যেটাকে ভেবেছিল। বাজে কথা। আর্তের সেবা-টেবা নয়। স্রেফ পাবলিসিটি। নিজেকে জাহির করা। তাই দিয়ে বিশেষ সুবিধে আদায়ের পথ পরিষ্কার করা।

দীপু নামের লোকটাকে ধন্যবাদ। শুভমের নষ্টামির মুখোস খুলে দিয়েছে। এইবার নিজের হাতে ওটাকে ছিঁড়ে দিতে হবে। প্রস্তুত হল প্রমিতা।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল শুভম। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রমিতা। শাড়ি বদলায়নি এখনও। দপ্ দপ্ করছে চোখ। শুভম তাকাতেই আগুন ধরে গেল তাতে। চিৎকার করে বলল, তোমার আসল চেহারাটা আজ আমি ধরতে পেরেছি। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার তফাৎ নেই একটুও। তোমরা সবাই সমান। লম্পট, মাতাল।

স্থির হয়ে গেল শুভম। জানালাটা বন্ধ ছিল। তবু এই বৃষ্টিতে ছুঁয়ে এসেছে জল পৈঠের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে রইল। এবারও কথা বলল না কোনও। সবটাই মজা করে লঘু করে দিতে পারছে না আর। পৈঠে থেকে ধারা নেমে এসেছে মেঝের ওপর।

প্রমিতা এগিয়ে এল সামনে। একেবারে মুখোমুখি শুভমের হিসেব চাইছে সে। বলছে খুব জোরে, বলো, অস্বীকার করতে পারো আমার কথা? বলো — বলতেই হবে তোমাকে।

সজোরে প্রমিতা চেপে ধরল শুভমের ডান বাহু। ঝাঁকুনি দিয়ে অপ্রকৃতিস্থের মতো একটানা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বলো, বলো, বলো।

এইবার বলতেই হবে। আর পারা যাবে না। যথেষ্ট হয়েছে। বারবার এই মেয়েটা তাকে অপমান করতে পারে না। এত কী অহংকার ওর? এই চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবিরাম নিষ্পেষণ সহ্য করেছে শুভম। বুঝতে পারছিল দীপের পাশে নিজেকে চোখে পড়ার মতো লাগছিল না মোটেই। এটাই কি অপরাধ তার? তার জন্যে যা খুশি বলে যাবে তাকে প্রমিতা? রিনির চেয়ে সে কতটা উন্নত শ্রেণীর প্রাণী তা বোঝানোর এই ভাষা? অসহ্য! শুভমের বুকের চূড়ো থেকে উল্টোপাল্টে নেমে আসছিল অজস্র পাথরের চাঁই। ধ্বস নেমেছে। ধীরে ধীরে দুহাতের মধ্যে মুঠো পাকিয়ে উঠছিল। চোখের ভেতর চমকে উঠছিল বিদ্যুতের শাখা প্রশাখা। ওর পদাহত পৌরুষ ড্রাগনের মতো আগুনে বিষ ছড়াতে ছড়াতে জেগে উঠছিল।

এই সময় ঝপ করে নিবে গেল আলো। লোডশেডিং। ঘনিয়ে এল অন্ধকার। নিঃসঙ্গ নির্জন প্রলয়ংকর অন্ধকার। আর তারপরেই উপড়ে এল পাহাড়ের চূড়া। প্রবল একটা 'না' ধ্বনিতে ফালা ফালা হয়ে গেল অন্ধকার। তার মধ্যে নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত হয়ে নিমেষে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল প্রমিতা।

এক ঘণ্টা, কি তারও কিছু বেশি। এই সময় ঘরের বাইরে জল পড়ার একটাও শব্দ ছিল না। রতিক্লান্ত রমণীর মতো ঘাড়মুখ গুঁজে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল সমস্ত প্রকৃতি। □

কবিতা ও তৃতীয় বিজ্ঞান

আনন্দ ঘোষ হাজরা

কস্মৈ দেবতা হবিষা বিধেম ? প্রশ্নটা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন দেবতাকে হবি প্রদান করা হবে ? হাতে বাদ্যযন্ত্র, কণ্ঠে গান আপোলো দেবতা না লোকপ্রসিদ্ধ শিব ? আপোলো দেবতার শুদ্ধ সংগীতময় কবিতা অনেকের কাছে কাম্য আবার অনেকের কাছে নয়। অন্যদিকে ভস্মমাখা শিবের গাজন সহজবোধ্যতা সত্ত্বেও কাম্য হবে না নিশ্চয়; যাঁরা কবিতাকে বহুল প্রচারিত ও সর্বজনগ্রাহ্য করতে চান তাঁদের কাছেও। কারণ কবিতা এখন কেবল আপোলো দেবতার সংগীতময়তাতেই আচ্ছন্ন নয়, ডায়োনিসিয়ানদের মেথার বিচ্ছুরণ কবিতাদেবীর চারদিকে একটা উজ্জ্বল অনধিগম্য বাতাবরণ সৃষ্টি করে ক্রমশ লোকসাধারণ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে — আপোলো দেবতার আশীর্বাদধন্য মালার্মেও যা পারেন নি। জনজীবন থেকে কবিতার দূরে সরে যাওয়ার পেছনে অবশ্য নানা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু একটা কারণ অবশ্যই প্রচলিত বিশ্ববোধকে ঠিকমতো বুঝতে না পারা। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের পর সামগ্রিক ভাবে সচেতন ভাবে বিশ্ববোধকে ধরার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যের কবিরা করেছিলেন কিনা তার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। চল্লিশের দশক পর্যন্ত কবিরা একরকমভাবে, আংশিকভাবে হলেও, পঠনপাঠনের মাধ্যমে হয়তো খানিকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রচলিত বিশ্ববোধকে ছুঁয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, বা বিশ্ববোধ যেহেতু একটি সর্ববাদী বোধ, সেহেতু সজ্ঞানে কেউ চেষ্টা না করলেও, কিছু হয়তো কবিতাতে প্রতিফলিত হয়েছে, তবু একথা জোর দিয়ে বলা যায়, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ছাড়া বা বিষ্ণু দে ছাড়া সজ্ঞান প্রয়াস দেখা যায় না। পঞ্চাশের বিনয় মজুমদারের কথাও অবশ্য উল্লেখ করতে হয়। তারও একটা কারণ আছে। একটা সময়ে, জায়মান সময়ে, বিশ্ববোধকে নিয়ন্ত্রিত করে সাধারণত এবং প্রধানত বিজ্ঞানভাবনা। এই বিজ্ঞানভাবনাকেই আমাদের কবিরা এখনও পরিহার করে চলেছেন। আমরা সবসময় মনে করছি সম্ভবত কবিতা ও বিজ্ঞান দুই মেরুর বাসিন্দা। মৈত্রীমৈত্রী ঘটানোর সজ্ঞান চেষ্টা আমরা করছি না, যদি সত্যিই তাঁরা দুই মেরুর অধিবাসী হন। একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্য সমালোচক যিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই আমি জানি, তিনিও এমন উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের ফলে আমাদের বিস্ময়বোধ কমিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু বিস্ময়বোধ কবিতার জনক সেহেতু কবিতাতে বিস্ময়বোধ কমে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বাড়ার ফলে কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কথাটা ঠিক এভাবে হয়তো তিনি বলেন নি, তবে যা বলেছিলেন তার অর্থটা মোটামুটি এরকমই। এই কিছুদিন আগেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট আন্দোলন করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই আন্দোলনের প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল আমাদের নিজেদের ভারতীয় ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে, আমরা বড় বেশি পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়েছি। এটা ত্যাগ করতে হবে। তাঁদেরও স্বেয়াল ছিল না বিশ্ববোধের কথা। তাঁরাও এক ধরনের খণ্ডিত বোধের বৃত্তে ঢুকতে চাইছিলেন। তাঁদের আপ্রাণ প্রয়াস থাকলেও আন্দোলনটি খুব বেশী দূর আগাতে পারল না এই কারণেই। অবশ্য তাঁদের ধন্যবাদও দিতে হয়, কারণ সম্ভবত তাঁরাই প্রথম বাংলা কবিতার গড্ডলিকাপ্রবাহে কিছু আলোড়ন আনতে পেরেছেন দীর্ঘ দিন বাদে। বিজ্ঞান — যা বিশ্ববোধের নিয়ামক — তা যে কত দ্রুত গতিতে আমাদের ধ্যানধারণা মূল্যবোধগুলিকে পাল্টে দিচ্ছে তা যদি একটু আমরা খেয়াল করতাম ! কিন্তু করব কি করে ? আমরা, কবিরা, সব সময়েই বিজ্ঞানকে অনধিগম্য ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কার্ল কাব্রুস বলেছেন, 'Science is spectrum analysis: Art is photosynthesis.' 'বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে সব কিছুকেই দেখে বিজ্ঞান, কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, সংশ্লেষের দৃষ্টিতে দেখে'— এই বোধ আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিংবা পোলিশ স্যাটায়ারিস্ট Stanislaw Jerzy Lee যেমন বলেছেন 'The hay smells different to the lovers than to the horses.' কবিরা প্রেমিক আর বিজ্ঞানীরা ঘোড়া এই দৃষ্টিভঙ্গিই দূরে সরিয়ে রেখেছে কবিতা আর বিজ্ঞানকে। আমরা কি বিজ্ঞানীদের বারবেরিয়ান (barbarian) মনে করতাম বা করি, কবিতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ? অথচ এই 'বারবেরিয়ান'দের না হলে যে আমাদের কারোরই চলে না এই কথাটাই আমরা ভুলে গেছি। গ্রীক কবি কনস্টানটাইন কাভাফির একটি বিখ্যাত কবিতার শেষাংশ এইরকম :—

"What does this sudden uneasiness mean, and

this confusion ? (How grave the faces have become !)
Why are the streets and squares rapidly emptying,
and why is everyone going back home so lost in thought ?
Because it is night and the barbarians have not come
And some men have arrived from the frontiers and
they say that there are no barbarians any longer
And now what will become of us without barbarians ?
These people were a kind of solution."

সুতরাং বারবেরিয়ান ভাবলেও এই বারবেরিয়ানরাই আমাদের সমাধান। সমাধান এই অর্থে যে এঁরাই আমাদের কাছে নতুন বিশ্ববোধের পরিচয় দেবেন, যাতে কবিতা অনেক বেশি শুদ্ধ হয়ে উঠবে। হয়ত এই নতুন বিশ্ববোধে প্রাণিত হয়ে কবিরা এমন উচ্চারণ করবেন যা আবার ঐ বৈজ্ঞানিকদেরই নতুন পথের ইঙ্গিত দেবে।

এবার আমার সীমিত ক্ষমতায় আমি বিশাল বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে এমন কয়েকটি পরিবর্তিত ধ্যানধারণার উল্লেখ করব, যাতে আমাদের মনে হতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনজনিত বোধের ফারাক ক্রমশ মুছে যাচ্ছে এবং বিস্ময় যদি কবিতার জনয়িতা হয় তাহলে আমাদের বিস্ময়বোধ কিভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে তৃতীয় বিজ্ঞান। এই তৃতীয় বিজ্ঞান মূলত আমাদের বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান। তার আগে, তৃতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা পেতে গেলে খুব সংক্ষেপে, আমার ধারণামত, প্রথম বিজ্ঞান ও দ্বিতীয় বিজ্ঞানের কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথম বিজ্ঞান, 'এ্যারিস্টটলিয়ান' বিজ্ঞান বা এরিস্টটল, টলেমি ও থমাস একুইনাসের বিজ্ঞানবোধ। এরিস্টটল ৩৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। টলেমি ১০০ থেকে ১৭০ খ্রিস্টাব্দ এবং থমাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর। (থমাস অবশ্য বৈজ্ঞানিক নন, ধর্মযাজক) সুতরাং এই প্রাথমিক বিজ্ঞান মোটমুটি ৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘকাল বিজ্ঞান ও দর্শনে মূলত কোনো প্রভেদই ছিল না। বিশ্ববোধ ছিল organic বা জৈবিক। এরিস্টটল প্রকৃতির বস্তু ও ঘটনাগুলি যে যুক্তিসম্মত প্রথায় নিয়মের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থমাস একুইনাস সেই প্রথাটিকে, খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধের অঙ্গীকৃত করে নিলেন। সমগ্র মধ্যযুগ পর্যন্ত এই বোধ ও ধারণাই প্রচলিত ছিল। বর্তমান বিজ্ঞানধারণার সঙ্গে এই ধারণা ছিল আমূল পৃথক। এর ভিত্তি যদিও ছিল যুক্তির ওপর, এর প্রতিষ্ঠা যদিও এমপিরিকাল (empirical) পদ্ধতিতে, তবুও সার্বিকভাবে, বিশ্বাসের ওপরই, এই বোধগুলি দাঁড়িয়েছিল। কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না এর থেকে বা প্রকৃতির ওপর কোনো মানুষী নিয়মক রীতি প্রযোজ্য হোত না। দৃষ্টিটা ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক (geocentric) পৃথিবীটা স্থির এবং একে কেন্দ্র করে আকাশের নক্ষত্র তারামণ্ডলী ঘুরে বেড়াত। সময় ছিল স্থির।

দ্বিতীয় বিজ্ঞান এই সব ধারণাকে ভেঙে দিল। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের শুরু ও পরিণতি — কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, বেকন, দেকার্ৎ এবং নিউটনের মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় বিজ্ঞানই আমাদের ধ্যানধারণা মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত করেছে দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে। সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এর প্রচার। নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দর্শন, ইতিহাস। বদলে দিয়েছে চিন্তার রূপরেখা। শুধু বদলে দেওয়া নয়, ধারণাগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি দৈনন্দিন জীবনযাপনে, কি অর্থনীতিতে এবং ডাক্তারী শাস্ত্রেও, একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শন যুক্তির দর্শন, কিন্তু বিশ্বাসের নয়, বরং সন্দেহের। প্রতিটি বস্তুকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করে বুঝে নেওয়ার পদ্ধতি, এমপিরিকাল পদ্ধতি দ্বিতীয় বিজ্ঞানের। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও — এঁদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল বিশ্ব সূর্যকেন্দ্রিক (heliocentric) পৃথিবীকেন্দ্রিক নয়। দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শন থেকেই আমরা জানতে পারলাম গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, যান্ত্রিকভাবে নিজের কক্ষপথে ঘুরছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে একই জায়গায় ফিরে আসছে। অর্থাৎ সময়ও গতিশীল কিন্তু প্রত্যাবর্তনশীল। অর্থাৎ সময় পুরোনো জায়গায় ফিরে আসতে পারে, রিভারসিবল (reversible)। টাইম মেশিনের কথা কল্পবিজ্ঞানের লেখকরা ভাবতে শুরু করলেন। বিশ্লেষণমূলক মনোভঙ্গির এই দর্শনের পিছনে ছিল দেকার্তের মতো মনীষা, যিনি বলে উঠলেন 'Corgito ergo sum' — আমি চিন্তা করি, সেজন্যই আমি আছি — অর্থাৎ জড় জগত মানুষের থেকে একেবারে পৃথক। শুধু জড় জগত কেন, যারা চিন্তা করতে পারে না তারা আলাদা সত্তা, মানুষের থেকে। তাঁর পদ্ধতিটিও বিশ্লেষণমূলক। ফ্রান্সিস বেকন খুব জোরের সঙ্গে এই পদ্ধতিটি প্রচার করলেন। এই পৃথকীকৃত সত্তাকে, মনুষ্যেতর সত্তাকে জানতে গেলে, প্রকৃতিকে জানতে গেলে, অংশ বিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে খুঁটিয়ে বিচার করে, যুক্তি সহযোগে, কার্যকারণতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, জানতে হবে। প্রকৃতি সম্বন্ধে

বলতে গিয়ে বেকন বললেন, 'Nature had to be hounded in her wanderings, bound into service, made a slave.' এই দ্বিতীয় বিজ্ঞান বস্তুতপক্ষে যান্ত্রিক বিজ্ঞান। সমগ্র পৃথিবী বা বিশ্ব যেন যান্ত্রিকভাবে নিয়ম মেনে যন্ত্রের মতো চলছে। কেপলার গ্রহের গতির যান্ত্রিক নিয়ম আবিষ্কার করলেন। চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছল নিউটনের সময়। আবিষ্কৃত হলো মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। প্রণয়ন করলেন গতিসূত্র। ক্যালকুলাসের নিয়মে অঙ্কের 'অ্যাবস্ট্রাকশনে' নির্দিষ্ট করে দিলেন এই গতিবিজ্ঞানকে দেকার্ৎ, নিউটনের, এই যান্ত্রিক কার্যকারণতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক, নির্দেশাত্মক (deterministic) দৃষ্টিভঙ্গির বিজ্ঞান, বিশ্বকে, বা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে যন্ত্রের মতো মনে করার এই বিজ্ঞান, আমাদের ধ্যানধারণা মূল্যবোধকে তিনটি শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলেই নাসা (NASA) রকেটে করে চাঁদে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে, সাধারণ মানুষও বিভিন্ন যানবাহনে চেপে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে মুহূর্তে আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে, এর ফলেই মানুষের জীবনকাল বৃদ্ধি পেয়েছে নানারকম ডাক্তারী শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এর ফলেই আবার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, কারণ টেকনোলজিক্যাল প্রগতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে— আমরা, একবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন দেখছি; এর ফলেই বিলাসের উপকরণ বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে ব্যবসার পরিধি ও মনোবৃত্তি। এর ফলেই আবার, অ্যাটম বোমা বানানো হয়েছে, দু-দুটো মহাযুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেছে। আলেকজাণ্ডার পোপ 'Proposed epitaph for Isaac Newton' বলে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির মধ্যে এরকম দুটি লাইন আছে —

> "Nature and Nature's laws lay hid in night
> God said, let Newton be! and all was light."

সমাজের সমস্ত স্তরকে যেমন এই বিজ্ঞান দর্শন আক্রমণ করেছিল, কবিতাও বাদ যায়নি। উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামের মতো কবিও বললেন, 'The poem is made of things — on a field.' কবিতায় বললেন, কবিতা হচ্ছে— 'strange arithmetic or chemistry of art / to dissect away / the block and leave / a separate metal / hydrogen / the flame, / helium, the pregnant ash." লক্ষ্য করার বিষয় ফ্রান্সিস বেকন প্রকৃতিকে 'her' বলছেন অর্থাৎ রমণীরূপে সম্বোধন করছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করার প্রবণতা যেমন এই দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শন এনে দিল তেমনি এনে ছিল রমণীদের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতাও। কারণ রমণী তো আমাদের দেশেও প্রকৃতিস্বরূপা। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিকতা। এই দ্বিতীয় বিজ্ঞানের ফলেই, কাজে কাজেই, আমরা প্রকৃতিকে ভেঙে দেখতে, প্রকৃতিকে নষ্ট করতে পিছপা হইনি যেমন, তেমনি নারীকেও বস্তু-বিভাজনের, বিশ্লেষণের মনোবৃত্তিতে দেখতেও পিছপা হইনি। সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে যৌনতা এসেছে। এমন কথাও উঠেছে যে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা কিছুই নেই। কৈফিয়ৎ দেবার বা যুক্তির অভাব হয়নি। আমাদের দেশে জয়দেব কালিদাসকে দেখিয়েছি চট করে। ভুলে গিয়েছি যে, কালিদাসের যে কাব্যসৌন্দর্য, সেটা সমগ্রতার সৌন্দর্য, সেখানে নারীদেহের বর্ণনাও— সামগ্রিক সৌন্দর্যের অভিষেকে অশ্লীলতা বা যৌনতাকে প্রকট করে না। ভুলে গেছি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সামগ্রিক ধ্বনি-মাধুর্যময় সংগীতধর্মী কাব্যসৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে অশ্লীলতা প্রকট হয়ে ওঠে না। ভুলে গেছি সংস্কৃত কখনও কথ্য ভাষা ছিল না, কাজেই সংগীতের আবরণ ছাড়াও গীতগোবিন্দের দেহ সাধারণের সামনে ভাষার আবরণ পরেও হাজির হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শনের চরমসীমায় জাত এই যে নগ্ন, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির যৌনতা, এর পরিচিতি আলাদা। আজকাল একটা বিশেষ ধরনের উপন্যাস, যৌনতাসর্বস্ব হয়ে উঠছে। অথচ আমরা তাকে পর্নোগ্রাফি বলছি না। কবিতার ক্ষেত্রেও নামী দামী কবিরাও আজকাল এ ধরনের কবিতা লেখায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে মূলে পৌঁছনর কথা বলে দ্বিতীয় বিজ্ঞান। সমগ্রের চেয়ে অংশকে প্রাধান্য দেয় দ্বিতীয় বিজ্ঞান, যেন অংশ বুঝলেই সমগ্র বোঝা যাবে, মেশিনের যেমন পার্টস জেনে একত্র করে জোড়া লাগালে সমগ্র মেশিনটি বোঝা যায়। অর্থাৎ অংশকেও ভাঙতে ভাঙতে মূলে চলে যাও। নিউটন ভাবতেন এই মূলও একটা নির্দিষ্ট পদার্থ — 'ফান্ডামেন্টাল ইউনিট'। অতএব সমাজে মৌলবাদের — ফান্ডামেন্টালিজমের, একটা ভূমিকা থাকবে এ আর এমন বিচিত্র কি? তাছাড়া নিউটন নিজে মনে করতেন, যেসব নিয়মগুলি মেনে এই বিশ্ব মেশিনটি চলছে সেসব নিয়মগুলিই মূল নিয়ম — ফান্ডামেন্টাল। এই বোধ, রূপ পাল্টে সমাজে ছড়িয়ে পড়তেও পারে। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের চরম মুহূর্তে মৌলবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে শেষ বারের মতো। পিতৃতান্ত্রিকতা শেষবারের মতো প্রকট হয়ে উঠতে পারে। যৌনতাও শেষবারের মতো বাজার মাত করতে পারে। সমগ্র থেকে অংশই যেহেতু বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেহেতু যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে পারে। ওদেশে তো গেছেই, আমাদেরও ভেঙে যাচ্ছে এত দ্রুত গতিতে, যে আমরা একটা জীবনেই অনেক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মতো বা আমাদের থেকে একটু বয়স্ক মানুষদের এই ভাঙন সহ্য করাও কঠিন হচ্ছে। কই আমাদের সাহিত্যে তো এর প্রতিফলন বড়

বেশি দেখছি না? যে পটভূমিকায়, যে গতিতে এই ভাঙন, সেটাকে ধরার মতো সাহিত্যিক সমরেশ বসুর পরে আর কি কেউ নেই? একটু আগেই সব কিছুই বলছিলাম 'শেষবারের মতো'। মৌলবাদ মাথা চাড়া দেবে শেষ বারের মতো। যৌনতা প্রকট হচ্ছে শেষবারের মতো। পিতৃতান্ত্রিকতা, পরিবেশক্ষয় শেষবারের মতো। তার কারণ, ইতিমধ্যে তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শন আমাদের অজ্ঞাতসারেই তার প্রভাব বিস্তার করেছে। তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শন আমাদের এতাবৎ রক্ষিত মূল্যবোধ ধ্যানধারণা, 'প্যারাডাইম'গুলি একেবারে আমূল বদলে দিচ্ছে। আমরা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন দেখছি। আমরা 'ফেমিনিস্ট' আন্দোলন দেখছি। আমরা অংশ ছেড়ে সমগ্রের কথা চিন্তা করছি। আমরা সময় ও কালের বুনোনে মহাশক্তি প্রবাহের একমুখীনতাকে অনুভব করতে পারছি। বুঝতে পারছি সময় ফিরে আসে না। বুঝতে পারছি 'এনট্রপি' বা 'বিশৃঙ্খলা'র মাধ্যমে কি করে শৃঙ্খলার দিকে বা সমতার দিকে যাচ্ছি আমরা।

এই তৃতীয় বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান। আমাদের সব ধ্যানধারণাকে ওলটপালোট করে দিয়ে একের পর এক বিস্ময়ের দরজা আমাদের চোখের সামনে খুলে দিল। এই তৃতীয় বিজ্ঞান আইনস্টাইন, ম্যাক্স্ প্ল্যাংক্, নীলস্ বোর, লুই দা ব্রগলি, স্রোয়েডিংগার, হাইসেনবার্গ, পৌলি ও পল ডিরাকের বিজ্ঞান। রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম থিয়োরির বিজ্ঞান। তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শনের কথা কিছু বলতে যাওয়ার আগে 'ডিডেরো'কে স্মরণ করা খুব আবশ্যক। কারণ 'ডিডেরো'ই বোধ হয় প্রথম বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যান্ত্রিক বিজ্ঞানের সীমাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করবার চেষ্টা করেছিলেন। যান্ত্রিক বিজ্ঞান তখনও জড় থেকে জীবনের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। 'ডিডেরো'ই প্রথম জড় থেকে জীবনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করেছিলেন, প্রায় ডে-কার্টেসকে অস্বীকার করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে উইলিয়াম ব্লেকও কবিতায় লিখলেন "May God us keep/From single vision and Newton's sleep."

অবশ্য বলা যেতে পারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই তৃতীয় বিজ্ঞানভাবনা রূপ নিতে শুরু করেছিল। এ এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সময়। এখন কি জীববিদ্যায়, কি পদার্থবিদ্যায়, কি ভূতত্ত্বে, কি নৃতত্ত্বে, কি জ্যোতির্বিজ্ঞানে নানারকম নতুন নতুন আবিষ্কার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমাদের চিন্তাজগতে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়ে দিচ্ছে। পুরোনো ধ্যানধারণা ভেঙে গিয়ে নতুন ধ্যানধারণা সৃষ্ট হচ্ছে। মনীষা, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য মনীষা, এক অনাস্বাদিত বিস্ময়ের সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণনা করার যোগ্যতা আমার নেই। অধিকারও নেই। আমি আমার বক্তব্যের সুবিধার জন্য অল্প কয়েকটি ঘটনার, আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করব। 'ম্যাক্রো' পর্যায়ে এবং 'মাইক্রো' পর্যায়ে দুটোতেই চিন্তার পরিবর্তন হচ্ছিল দারুণভাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'ম্যাক্রো' পর্যায়ের কথা প্রথমে ধরা যাক। এডউইন হাব্‌ল্ ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সেই, তাঁর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের তত্ত্ব প্রচার করলেন। আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইংরেজিতে যাকে 'universe' বলে তা যে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে, এই তত্ত্ব আমরা জানতে পারলাম। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গ্যামো, আলফার ও হান্‌স্ বেট 'বিগ্-ব্যাং হাইপথেসিস' ১৯৪৮ সালে (Big Bang Hypothesis) প্রচার করলেন। এটা একটু বলা দরকার। আনুমানিক দুহাজার কোটি বছর আগে সমস্ত শক্তি একজায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল। হঠাৎ এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে এবং শক্তি নির্গত হয়ে পড়ে। সেই শক্তিপুঞ্জ থেকেই ক্রমশ সৃষ্টি হয় সমগ্র সৌরজগত। সেই মুহূর্ত থেকেই কি সৃষ্টি হল সময় ও কাল? তার আগে কি? অনন্ত শূন্যতা? কালহীন? স্থানহীন? কোথা থেকে এল এই কেন্দ্রীভূত শক্তিপুঞ্জের সমাহার? কেন এই মহাবিস্ফোরণ? কে ঘটাল এই বিস্ফোরণ? এই সব প্রশ্ন আজ বিজ্ঞানীদের বিচলিত করেছে। তাহলে কি এই অবস্থান — একটা singularity? এখানে কি দ্বিতীয় বিজ্ঞানের কার্যকারণতত্ত্ব সব লোপ পেল? তাহলে কি কার্যকারণতত্ত্ব বলে কিছু নেই? বিগ্-ব্যাং শুধু হাইপথেসিস মাত্র নয়, প্রমাণিত সত্য। পেনজিয়াস এবং উইলসন সেই সময়ের অশ্রুত ধ্বনির অণুরণন শুনেছেন। এর জন্য তাঁদের নোবেল প্রাইজও দেওয়া হয়েছে। তারও আগে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর থিয়োরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে। আমি জেনারেল থিয়োরি, স্পেশাল থিয়োরির পার্থক্যের দুরূহ জটিলতায় যাব না। শুধু মাত্র উল্লেখ করব $E = MC^2$ নামক বহুল প্রচলিত ফর্মুলাটির কথা। অর্থাৎ আলোকের গতিতে 'মাস' বা 'ভর' এবং 'এনার্জি' বা 'শক্তি' সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জড় ও জীবনের কোনো পার্থক্যই থাকল না। ১৯৫৩ সালে স্টানলে মিলার ল্যাবরেটরিতে পৃথিবীর আদিম অবস্থার একটা পরিবেশ তৈরী ক'রে দেখাতে সক্ষম হলেন যে এই পৃথিবীতেই জীবনের বিল্ডিং ব্লকগুলি (DNA, RNA ইত্যাদি) তৈরী হওয়া সম্ভব। সুতরাং জড় থেকে জীবন। ডারউইন-ওয়ালেসের বিবর্তনবাদও এতে একটা আরও স্থির ভিত্তি পেল। ডারউইন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে বড়। তাঁর জীবনকাল ১৮০৯-১৮৮২। ওয়ালেসও

তাই। ডারউইনের 'Origin of Species' বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। কিন্তু ১৮৭২ সালের মধ্যেই বইটির ছয়টি সংস্করণ শেষ হয়ে যায়।

এসব তো গেল 'ম্যাক্রো লেভেলে'র কথা। 'মাইক্রো জগতে'র আরো অভূতপূর্ব বিস্ময় আমাদের সামনে এনে দিল পরমাণুর গঠন ও কোয়ান্টাম থিয়োরি। নিউটনের সূক্ষ্মতম 'সলিড পার্টিকেলের' (solid particle) তত্ত্ব এখন কোথায় ? রাদারফোর্ড বললেন প্রোটনেরা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে এবং ইলেকট্রন গ্রহগুলির মতো নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে। চাডউইক ১৯৩২ সালে দেখালেন নিউক্লিয়াস হল প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত অবস্থা। তার আগেই ডেনমার্কের পদার্থবিদ নীলস্ বোর পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইলেকট্রনের আবর্তপথের কথা জানালেন। মাক্স প্লাংক, নীলস্ বোর, হ্রোয়েডিংগার, আইনস্টাইন ইত্যাদি যে সব বৈজ্ঞানিকদের নাম করেছি তাঁরা দেখালেন যে ইলেকট্রন আবর্তপথে ঘুরছে এটা ঠিক এত সহজে বলা যায় না। ইলেকট্রন একটা আবর্তপথ থেকে আরেক আবর্তপথে লাফাতে পারে। উচ্চ এনার্জি লেভেলে যেতে পারে, আবার উচ্চ এনার্জি লেভেল থেকে নিম্ন এনার্জি লেভেলেও আসতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কিছু এনার্জি নির্গত হয়ে আসে। একে কোয়ান্টামের ইউনিটে পরমাপ করা যায়। ফোটনও বলা যায় একে। দেখা গেল এই আবর্তপথ গ্রহের কক্ষপথের মতো নয়। ইলেকট্রন কখনও ঢেউয়ের মত কখনও বস্তুর মতো ব্যবহার করে এবং আবর্তপথের ঠিক কোন্ মুহূর্তে কোন্ জায়গায় এর অবস্থান বোঝা কঠিন। ইলেকট্রন, আলোর কণা, কখন যে ঢেউয়ের মত ব্যবহার করবে, কখন যে পার্টিকল বা বস্তুর মতো ব্যবহার করবে কে জানে ? সৃষ্টি হল 'থিয়োরি অব্ আন্সারটেইনটি'র। অনিশ্চিতের রাজত্ব এখানে। ইলেকট্রন কখন কোন্ মুহূর্তে আবর্তপথের কোথায় থাকবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, বলা যাবে 'সম্ভবত, এই জায়গায় এই মুহূর্তে আছে'। সৃষ্টি হল 'থিয়োরি অব্ প্রোবাবেলিটি'র। ডেভিসন ও থম্পসন ১৯২৭ সালেই ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়েলিটির (wave particle duality) থিয়োরির জন্য নোবেল প্রাইজও পেয়ে গেছিলেন আগেই। কাজেই বস্তুর স্বরূপ যে সত্যিই কি, তা বোঝা যায় না। পরীক্ষাগারে, বাব্ল্ চেম্বারে, যে ছবি, যে নকশা, যে রূপান্তর দেখা যায়, যে গতি দেখা যায় তার প্রকৃত স্বরূপ কি, তা আমাদের নিউটনীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞানের বদ্ধমূলবোধে একেবারেই বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না এজন্য যে বস্তুকে যখন বলি পার্টিকেল বা ঢেউ, তখন যে ঢেউয়ের কথা আমরা মনে করি তা কোনো থ্রি-ডাইমেনশ-নাল ঢেউ নয়, জলের ঢেউয়ের মতো। বলা যেতে পারে এই ঢেউ একটা 'probability pattern'। ঢেউ হলেও হতে পারে, পার্টিকেল হলেও হতে পারে একরূপ একটা অবস্থা। এই 'probability pattern' বোঝার জন্য একটা অঙ্কের ফর্মালিজ্ম্ আছে অবশ্য, তবে সে দুরূহতা আমাদের জন্য নয়। আমি বুঝিও না। শুধু এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট যে, এই probability প্যাটার্নের মধ্যে কোনো কিছুর অবস্থান, বলা যাবেনা, অস্তিত্বের দিকে অথবা অনস্তিত্বের দিকে। 'এক্জিস্টেন্স্' নয়, 'নন্ এক্জিস্টেন্স্'ও নয়। ইংরেজিতেই বলা যেতে পারে 'tendency to exist'।

ওপেনহাইমার বলছেন —

"If we ask, for instance, whether the position of the election remains the same, we must say 'no'; if we ask whether the electron's position changes with time, we must say 'no', if we ask whether the electron is at rest we must say 'no'; if we ask whether it is in motion, we must say 'no'."

এ এক আশ্চর্য বিস্ময়ের জগত। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের বদ্ধমূল ধারণায় বোঝা যাবে না। উপনিষদে বলা হচ্ছে — 'তৎ এজতি, তৎ ন এজতি' ইত্যাদি। শ্লোকটিতে পরে ফিরে আসব। এর থেকে কয়েকটি দার্শনিক সিদ্ধান্তে আসা যায়। বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না। সবই যেন ঢেউ, সবই যেন আলো, সবই যেন শক্তি, সবই যেন গতি, সবই যেন বস্তু, এবং এমন বস্তু বা ঢেউ, যা কিনা নানাভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। বাব্ল্ চেম্বারে পরীক্ষায় পার্টিকেল বিশ্লেষণের যে নকশাচিত্র পাওয়া যায় তা অংশবিশেষকে বুঝতে সাহায্য তো করেই না বরং তারা যেন মনে হয় আরো কিছুর সঙ্গে যুক্ত এবং এই সংযোগসূত্র যেন অন্তহীন। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন-পোডোলস্কি-রোজেনের মানসিক পরীক্ষা যা 'EPR' নামে পরিচিত এবং 'বেলে'র উপপাদ্যের কথা মনে করা স্বাভাবিক। দুটি আবর্তিত ইলেকট্রন, একটির যদি নিজ কক্ষের চারদিকের আবর্তন হয় ঊর্ধ্বমুখী, অন্যটির নিজের কক্ষপথের চারদিকে আবর্তন হবে নিম্নমুখী এবং একটি ইলেকট্রনকে যত দূরেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, অন্যটি ঠিক বিপরীতমুখী আবর্তন প্রদর্শন করবে। ধরা যাক ঊর্ধ্বমুখী ইলেকট্রনটি যদি কলকাতায় রাখা যায় এবং অন্য ইলেকট্রনটিকে সরিয়ে যদি লস এঞ্জেল্সে রাখা যায় বা ধরা যাক মঙ্গল গ্রহেও রাখা যায় তাহলে সেই অন্য ইলেকট্রনটি সব সময় নিম্নমুখীই থাকবে। অর্থাৎ যতদূরেই তারা থাকুক তারা পরস্পরকে যেন চিনতে পারছে। এ কেমন সংযোগসূত্র যা দূরত্বের ওপর নির্ভর করে না, যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছে। সুতরাং আর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

নয়, একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হল। যান্ত্রিক দ্বিতীয় বিজ্ঞানের ভেতরে ভেতরে দেখা নয়, সমগ্রকে বোঝবার চেষ্টা করা। থার্মোডাইনামিক্স্-এর দ্বিতীয় সূত্রটির কথাও মনে রাখা আবশ্যক। এনার্জি বা মহাশক্তি উচ্চমাত্রা থেকে নিম্নমাত্রায় প্রবাহিত হয়। এটাই শৃঙ্খলা। অর্থাৎ সবসময় এনার্জি প্রবাহ এমন থাকবে যাতে সামগ্রিকভাবে শক্তিসাম্য আসে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় শক্তি প্রবাহ উচ্চমাত্রায় সংহত হয়ে আছে, যদিও পারিপার্শ্বিক নিম্নমাত্রার। যেমন জীবদেহ। এক্ষেত্রে তাহলে বিশৃঙ্খলা। এবং এই বিশৃঙ্খলাই তাহলে সৃষ্টি! এই বিশৃঙ্খলার বৈজ্ঞানিক নাম 'এনট্রপি'। তাহলে এনট্রপি মানেই সৃষ্টি ? বিশৃঙ্খলা থেকেই কি তাহলে সৃষ্টি হচ্ছে সব কিছু! এ কেমন বিস্ময়ের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হল ? এই জীবদেহের সংহত উচ্চমাত্রার শক্তি তাহলে ধীরে ধীরে নিম্নমাত্রার দিকে চলে যাবে এবং জীবদেহের শক্তি পারিপার্শ্বিক শক্তির সঙ্গে সমতায় আসবে, বা আসবার চেষ্টা করবে এর নামই তাহলে মৃত্যু ? অর্থাৎ শৃঙ্খলাই কি মৃত্যু ? না কি, তাহলে, মৃত্যু বলে কিছুই নেই ? জড় ও জীবনে যদি পার্থক্য না থাকে, যদি অনন্ত শক্তিপ্রবাহের মধ্যে অণুকণাগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে জড়দেহ বা জীবদেহের সৃষ্টি হয়, সাময়িকভাবে, তাহলে আমার দেহের যে কোনো অণু, কখনও না কখনও কোথাও না কোথাও, হয়তো অন্য কোনো নক্ষত্র বা গ্রহে বা যে কোনো 'কসমিক বডি'তে বর্তমান ছিল! তাহলে মৃত্যু বলতে সত্যিই কি কিছু নেই ?

এবার সংক্ষেপে তুলনায় আসতে পারা যায়। দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শন যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শন, যার থেকে বাবসার মনোবৃত্তি জন্মায়, যার থেকে প্রতিযোগিতার মনোভাব জন্মায়, যার থেকে আত্মসর্বস্বতা জন্মায়, যার থেকে অন্যের প্রতি উদাসীনতা জন্মায়, যার থেকে মানসিক চাপ বাড়ে, সমাজ, মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিজ্ঞান, অংশের বিজ্ঞান, সমগ্রের নয়। দ্বিতীয় বিজ্ঞানে পিতৃতান্ত্রিকতা প্রাধান্য পায়, দ্বিতীয় বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিজ্ঞানে মৌলবাদ মাথা চাড়া দেয়। আজ আমাদের সমাজে দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শনের চরম প্রকাশ কি দেখছি না ? সাহিত্য এবং কবিতাতেও কি এর প্রতিফলন দেখছি না ? তৃতীয় বিজ্ঞানে কার্যকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নজাগে, বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না, নিজেকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় না, সমগ্রতার বোধ জায়মান হয়ে ওঠে, জড় ও জীবনের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে নিজেকেও বিশ্বপ্রবাহের অংশীদার মনে হয়। ফলত পরিবেশ সচেতনতা বাড়ে। পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে 'ফেমিনিস্ট' আন্দোলন জায়মান হয়। পরস্পর পরস্পরের সংঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হয়। যতদূরেই থাকি, আমাদের যৌথ পরিবার ভেঙে গেলেও আমরা সবাই, গাছ-পালা, নদ-নদী সবকিছুই সংযোগসূত্রে বাঁধা। এই সংযোগসূত্রই কোয়ান্টামতত্ত্বের আসল অবদান। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করা নয়, একেবারে সংযোগসূত্রে নিজেকে নিয়েই গ্রথিত, গ্রন্থিত করা — এই বোধ — এ এক নতুন ধরনের মানবতাবোধ। পরীক্ষাগারে ঠিক আমি যেমনটি চাইব, বস্তুটি তেমনই আচরণ করবে। যদি তরঙ্গের মতো চাই, তরঙ্গ। যদি পার্টিকল ভাবি পার্টিকল। অর্থাৎ পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকের মানসিকতা (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিজেই) একটি উপাদান। এক্ষেত্রে বস্তুর স্বরূপ কি কখনও জানা যাবে ? এ কি অসাধারণ বিস্ময়! এই বিস্ময়, এই সব বোধ কি কবিতায় বা সাহিতো সঞ্চারিত হবে না ? বিজ্ঞান বলেই কি সাহিত্য থেকে আলাদা হবে তার ধ্যানধারণা ? এই তো মেরুমৈত্রী!

আমরা প্রাচ্যদেশের লোকেরা এ সব কথা কখনও জানতাম না এরকম নয়। বরং এটাই তো আমাদের দর্শন। সেই উপনিষদের যুগ থেকে। রবীন্দ্রনাথে তো ছিলই এই বোধ, জীবনানন্দেও ছিল। তারপর আর দেখছি না কেন ? ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের কথা স্মরণ করুন। বিগ্-ব্যাং-এর যে সিংগুলারিটির (singularity) কথা বিজ্ঞান বলছে তারই কি চমৎকার বর্ণনা নয় এটি ?

না সদাসীৎ ন সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্ত্র
কীমাসীদ্ গহনম্ গভীরম্।
ন মৃত্যুরাসীদ মৃতম্ ন তর্হি
ন রাত্রা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ
আনীদ্ তনবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাম

তখন অসৎ ছিল না, সৎ ও ছিল না। রজঃ বা ধূলিকণাও ছিল না। বোমা বা আকাশ বা তারপরও কিছু ছিল না। কি আবরিত হবে ? কাকে আবরিত করবে ? আবদ্ধ কোথায় ? গহনগভীর কোথায় ? মৃত্যুও ছিল না, মৃত ছিল না। রাত্রি দিন কিছুই ছিল না। জ্ঞানও ছিল না তখন ..... ইত্যাদি।

জড় ও জীবনে যে কোনো পার্থক্য নেই, সবকিছুকেই আচ্ছন্ন ক'রে আছে যে মহাশক্তি যে সংযোগশক্তি তার বর্ণনা ঐশোপনিষদে

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদুসর্বস্যাস্য বাহাতঃ

অথবা

অসূর্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকে চাত্মহনোজনাঃ

অবিদ্বান মানুষ মৃত্যু পরবর্তী আত্মাকে অন্ধকার ব'লে জানে। কিন্তু তা নয় — এই বিরাট বিশ্বাস আমাদের চালিত ক'রে রেখেছে। মৃত্যু সম্বন্ধে এই বোধ এখন পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে। অর্থাৎ সবই যদি সেই বিশাল এনার্জি বা মহাশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে এই জীবন, সাময়িক এনট্রপির এই জীবন, আবার নতুন কোনোরূপে প্রকাশিত হবে। সুতরাং মৃত্যু কোথায়? এই বিশাল শক্তি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, এত দ্রুত এই ব্রহ্মাণ্ড 'expand' করছে যে আমরা তার কোনো পরিমাপ পাই না। ভাবি আবার কখনও কি 'বিগ্ ক্রান্চ্' (Big-crunch) আসবে, আবার সব স্থিরতার দিকে, কার্যকারণতত্ত্ববিহীন সিংগুলারিটিতে (singularity) পর্যবসিত হবে? এই স্থিতি ও গতির কথাই উপনিষদের কথায়

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপুবন্ পূর্ব মর্ষৎ
তদ্ধাবতোঽন্যানতেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন অপো মাতরিশ্বা দধাতি।

অথবা কঠোপনিষদের কথায় —

নজায়তে ম্রিয়তেবা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

উপনিষদ থেকে এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তিনি সজ্ঞানে এই তৃতীয় বিজ্ঞানকে বরণ করেছিলেন প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে এ রকম মিল দেখেই সম্ভবত। বিশেষত শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি ও বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথের এরকম বোধের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। Wave particle duality সম্পর্কিত যে জটিল তত্ত্ব, তার জটিলতার মধ্যে না গিয়েও কী সহজভাবে রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর পেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠলো, তার চলার ভঙ্গিটা কি রকম। সেও এক আশ্চর্য ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না। কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হলো। জানিয়ে দিলো আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে, অতি খুদে ছিটে গুলির মত, ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উল্টো খবরের মিলন হলো কোনখানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উল্টো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে, বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা কিছু, ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো — এর মানে কি, কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারলেন না।' সমগ্র রবীন্দ্ররচনায়, বিশেষ করে শেষ পর্যায়ের রচনায় তাঁর এই বোধ ছড়িয়ে আছে। আমি এই আলোচনায়, বিবর্তনবাদের কথা আলোচনা করিনি ঠিক মতো, প্লেট টেকটোনিক্সের কথাও বলিনি, বংশগতি বিজ্ঞানের কথাও বলিনি। রবীন্দ্রনাথে এ সবই প্রতিফলিত। আমি আনা একটি প্রকাশিত চিঠির এ সবের উল্লেখ করেছি। তবে আগ্রহী, সুধী পাঠকদের কাছে অনুরোধ করব আর কিছু না হোক, শেষ সপ্তকের একুশ সংখ্যক কবিতাটি — যার নাম 'নতুন কল্পে' এ প্রসঙ্গে যেন তাঁরা আরেকবার স্মরণ করেন। দীর্ঘ কবিতাটি আমি উল্লেখ করতে পারতাম। করলাম না। শুধু বলব, কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবকে বিজ্ঞানভাবনার, তৃতীয় বিজ্ঞান ভাবনার চূড়ান্তরূপ, তারপরের স্তবকেই ইতিহাসবোধ বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র কবিতাটিকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করেছে যে এখনও পর্যন্ত কোনো বাংলা কবিতাই ঐ স্তরের কাছাকাছি যেতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

সময়ের ধারণা, গতিবিজ্ঞানের ধারণা, এনার্জিপ্রবাহের ধারণা ও বিবর্তনবাদের ধারণা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির গ্রন্থে বিপুলভাবে লক্ষণীয়। এ ব্যাপারটিও আমি অন্য একটি প্রকাশিতব্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। একটি উদাহরণ শুধু আমি এখানে দেব। 'রিসট্ ওয়াচ' কবিতাটির প্রতি একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করছি।

"জলপাই পল্লবের তলে ঝরা বিন্দু বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো — জনহীন — বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত স্তিমিত আরো করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।'

যাদের জীবনী দু-এক মুহূর্ত গড়া হবে, কবিতায় তারা হচ্ছে 'মেঘ

যা সাময়িক ঘনবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দু/এক মুহূর্ত পরে আবার তারা জেগে উঠবে এবং যেখানে জেগে উঠবে, সেখানটা, 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির'। এনট্রপি বা শঙ্খলাহীনতার বোধ না থাকলে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না বোধ হয়। এই রৌদ্র বা মহাশক্তি অফুরন্ত, কিন্তু মহাশক্তির সমতা কখনই আসে না। আবার সংহত হয়ে মেঘ হতে হয় এবং পুনরায় মেঘ হয়ে জেগে ওঠা মানেই আবার সাময়িক হলেও তিমিরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। শক্তি সমতাই যে অন্ধকারের শেষ পর্যায় অফুরন্ত রৌদ্রের স্থান এবং সাময়িক জীবন যে অন্ধকার, অনন্ত তিমির, তার আরো স্পষ্ট প্রকাশ আছে 'সপ্তক' কবিতাটিতে। কিন্তু আর উদাহরণ বাড়াব না।

তৃতীয় বিজ্ঞান দর্শনের এই holistic ecological দৃষ্টিভঙ্গি, তৃতীয় বিজ্ঞান দর্শনের সমগ্রতাজনিত এই বিশেষ মানবতাবোধ যার অপর নাম বিশ্ববোধ তা কি সঞ্চারিত হয়ে উঠবে না আবার বাংলা সাহিত্যে, কবিতায়? অনেক চতুর্থ বিজ্ঞানের কথা বলেন এখন, এই সমগ্রতার কথা চিন্তা করে। 'জিওফি ফিট'-এর বুট-স্ট্র্যাপ (Bootstrap) হাইপথেসিস বা ডেভিড বোমের হলোগ্রাম (hologram) হাইপথেসিসের কথা বলেন। আমি সে সব আলোচনায় যাব না, কারণ সেগুলো প্রায় কিছুই বুঝি না। লাভলকের 'গইয়া চেতনার' আলোচনাতেও যাব না। তবু একথা কি সত্য নয় যে এখন পৃথিবী আর যান্ত্রিক নয়। পৃথিবী — সমগ্র পৃথিবী যেন জৈব চেতনা সম্পন্ন, অর্গানিক (Organnic)। এসব বোধ কি কবিতায় এলে খুব দোষের হবে? না কি কবিতা বা সাহিত্য অন্য মাত্রা পাবে?

একটা কথা উঠতে পারে, আমাদের প্রাচ্য দর্শনে এ চিন্তা যদি নতুন না হয়, তাহলে এত হৈচৈ করে বলারই বা কি আছে? নতুনত্বই বা কি? আমার কথা হচ্ছে, প্রাচ্যে যে বোধের জন্ম ধ্যান বা ইনটুইশন থেকে, পাশ্চাত্যে আজ সেখানে বিজ্ঞান পৌঁছেছে দ্বিতীয় বিজ্ঞানের প্রদর্শিত যুক্তির মাধ্যমে, মানুষের সাধারণ বুদ্ধির কাছে আবেদন রেখে। সুতরাং আগে আমাদের দীক্ষিত মানুষের কাছে যে বোধ সীমাবদ্ধ ছিলো, আজ পাশ্চাত্যদর্শন তা মোটামুটি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে। অঙ্কের abstraction আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যদর্শনের যে মিলন ঘটছে সেটাই বড় কথা। এখানে কবির ও সাহিত্যিকের দায় আছে বৈকি!

তাহলে কবিতা বা সাহিত্য বা বিজ্ঞানে কি কোনো তফাতই নেই? অনেক আছে। সে আলোচনায় যাবো না। তবে একটা বড় প্রভেদ উল্লেখ করব। সেটা হচ্ছে ভাষার প্রয়োগের প্রভেদ। বিজ্ঞানের ভাষা অঙ্কের abstraction এর ভাষা। কবিতার ভাষা ব্যাঞ্জনাধর্মী। এই প্রভেদ বোঝাতে আমি মিরাক্কাস হোলবের একটি কবিতার অনুবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে আজকাল বিদেশে অনেক কবি, কবিতার ও বিজ্ঞানের মেরুমৈত্রী সম্ভব করে তুলতে পেরেছেন বোধের দিক থেকে। হোলুব তাঁদের অন্যতম। মারিন সোরেস্কু আছেন। আবার ভাস্কো পোপা, তৃতীয় বিজ্ঞানের বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়েই বোধ হয় পুরোনো মিথে ফিরে যাচ্ছেন। এসব ব্যাপার পৃথক আলোচনার বিষয়। হোলুবের যে কবিতাটির কথা বলছিলাম তা অনুবাদে এরকম:——

কবিতাটির নাম 'যাদুকর জিটো' ——

'রাজাকে আনন্দ দেবার জন্য তিনি জলকে মদে পরিণত করেন
ব্যাঙগুলোকে পদাতিক, কাঁচপোকাগুলোকে শেরিফ
এবং একটা ইঁদুর দেখতে দেখতে মন্ত্রী হয়ে যায়।
তিনি নত হন, আর তাঁর আঙুলের ডগায় ডেইজী ফুল ফুটে ওঠে,
তাঁর কাঁধের ওপর বসে একটা পাখি গান গাইতে থাকে।

বাঃ বাঃ

রাজা বললেন: অন্য খেলা ভাবো তো হে
একটা কালো নক্ষত্র দেখাও দেখি:-
সুতরাং কালো নক্ষত্র উদ্ভাবিত হলো।
: শুকনো জলের কথা ভাবো তো হে:
সুতরাং তিনি শুকনো জল দেখালেন
ঘাস দিয়ে বেঁধে ফেলা নদীর প্রবাহ?
তিনি তাও দেখালেন।

বাঃ বাঃ

একটি ছাত্র উঠে এসে প্রশ্ন করল
প্রমাণ করুন
সাইন আলফা একের চেয়ে বড়ো।

এবার জিটোর মুখ খুব মলিন হয়ে গেলো
খুব বিমর্ষভাবে তিনি বলে উঠলেন:
ভীষণ দুঃখিত। +১ এবং -১

সাইন সর্বদা মধ্যে থাকে
একে নিয়ে কিছুই করা যায় না।
এবং তারপর তিনি ধীরে ধীরে
সভাসদদের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে
বিশাল সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে
সংক্ষেপে বলতে গেলে
বাড়ি গেলেন।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য, দর্শন, সবই সত্যের অনুসন্ধান করছে।
এখনও পাওয়া যায় নি ? কখনও পাওয়া যাবে কি ?
হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্য পিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষন অপাবৃনু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।

উল্লেখপঞ্জী(রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, ঋগ্বেদ ও উপনিষদ বাদে)

(1) The Turning Point —— Fritjof Capra
(2) Uncommon wisdom —— Fritjof Capra
(3) Tao of Physics —— Fritjof Capra
(4) Brief History of the time —— Stephen Hawking
(5) The Awakening Earth —— Peter Russel
(6) The Creation of Life —— Andrew Scott
(7) The Making of Mankind —— Richard Eleakey
(8) A field guide of Contemporary Poetry and poetics; Editors —— Stuart Friebert and David Young
(9) Six poets of Modern Greece —— E. Keeley and P. Sherrard
(10) Selected Poems —— Miroslav Holub
(অনুঃ I. Milner & G. Theiner)
(11) Order out of Chaos —— Ilya Prigogene & Isabelle Strangers
(12) Process and Reality : An essay in cosmology —— A. N. Whitehead
(13) মিরোস্লাভ হোলুব ও তাঁর কবিতা

অনুবাদ : আনন্দ ঘোষ হাজরা

মাটি

সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মাটির অন্যান্য ব্যবহার

প্রতিবছর পৃথিবীতে যে দুশো পঞ্চান্ন হাজার কোটি টন উদ্ভিজ্জ বস্তু তৈরি হয় তার ভিত্তি হল মাটি। মাটির প্রাথমিক দায়িত্ব হল কৃষিকর্ম এবং বনসৃজন। তার ফলে মেলে অন্নের জন্য খাদ্যাদি, বসনের জন্য তন্তু এবং নির্মাণ কাজের জন্য কাঠ। এই বিপুল ক্রিয়াকাণ্ড চলছে নিরবধি একই জায়গার মাটিতে। অতএব বলা যায় মাটির বিনাশ ঘটে না। অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু সর্তক থাকলে মাটিকে সজীব রাখা যায়। কৃষি ও বনসৃজন ছাড়াও মাটিকে যে কতরকম কাজে লাগানো হচ্ছে তার অনেকগুলিই নজরে পড়ে না তাই অজানা।

ইট তৈরি : মাটির অপমৃত্যু

যে ব্যবহারগুলি খুব বেশি নজরে পড়ে তাদের মধ্যে মাটি দিয়ে ইট তৈরির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। ইট ব্যবহার করে নানা বৈচিত্র্যময় সৌধ সৃষ্টি মানুষের উন্নততর সভ্যতার পরিচয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ইটের তৈরি কত সভ্যতার উত্থান ঘটেছে, কত সভ্যতার পতন ঘটেছে, ইতিহাসের পাতায় তা স্পষ্টাক্ষরে লেখা হয়েছে। কিন্তু যে মাটি দিয়ে ইট তৈরি তার কী হল ? চিরতরে বিনাশ। সে মাটিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সভ্যতার প্রসার ও অগ্রগতি এখন চলছে অতি দ্রুত হারে। ফলে একই দ্রুত হারে চলেছে মাটির বিনাশ। নতুন নতুন শহর তৈরির প্রয়োজন মেটাতে প্রতি দিন কী পরিমাণ মাটিকে আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শহরের আশে পাশে কৃষিজমিতে ইট ভাঁটার কুৎসিত চেহারা দেখে। যে মাটি বছরের পর বছর প্রয়োজনীয় সম্পদ তৈরি করতে পারত, তাকে একবার ব্যবহার করেই তার অমূল্য ক্ষমতা হরণ করা হল। ইট তৈরি মাটির অপমৃত্যুর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। যে মাটি দিয়ে ইট তৈরি হল সে যেমন চিরতরে নষ্ট হল, ইটখোলার চার পাশের মাটিও তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যে মাটি কৃষি কর্মে উপযোগী, ইট তৈরির সাথে সাথে উপযুক্ত কৃষিজমি অবলুপ্ত হচ্ছে। অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় যে চাষযোগ্য জমির মালিকরা সাময়িক আর্থিক লাভের জন্য ইট ভাঁটার মালিকদের কাছে জমি বিক্রি করছে। ইট ভাঁটার কুৎসিত দৃশ্য কী বেদনাদায়ক মাটিকে যারা ভালবাসেন তারাই উপলব্ধি করবেন। অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে না পারলে খাদ্যাদি উৎপাদনের জমি ক্রমশ কমতে থাকবে। ফলে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হবে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

শিল্প রূপায়ণ : মাটির অপমান

শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার আর্থিক সমৃদ্ধি ও সভ্যতার মাপকাঠি। এই জন্যই সর্বত্র দ্রুতগতিতে শিল্পরূপায়ণ কর্ম চলছে। শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম প্রয়োজন জমি। এখানেও সাময়িক আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে চাষযোগ্য জমির মালিকরা শিল্পপতিদের কাছে জমি বিক্রয় করছে। কারখানা স্থাপন ছাড়া কর্মিদের বাসস্থান এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাম্প্রতিক প্রয়োজনের অধিক জমি অধিকার করতে হয়। চালু কারখানা থেকে নির্গত বাষ্পীয় এবং তরল পদার্থ মাটি এবং পরিবেশ দূষণ করছে। উপরন্তু আশেপাশের জমিও ক্রমশ চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ক্ষণিক লাভের মোহ ত্যাগ করে জমির মালিক যদি অপূরণীয় ক্ষতির কথা চিন্তা করত তা হলে হয়ত বিপর্যয় এড়ানো যেত। অন্যথায় শিল্পপতিরা যদি আংশিক অসুবিধা স্বীকার করে পতিত অথবা চাষের অযোগ্য জমিতে শিল্প স্থাপন করেন তা হলেও চাষের জমি রক্ষা পেতে পারে। বুঝতে হবে প্রকৃতির দান মাটি— না

বর্তমান মালিকের, না অর্থের বিনিময়ে কেনা শিল্পপতির। মাটি সর্বকালের জন্য সব মানুষের সম্পদ এবং প্রাপ্য অধিকার। টাকা দিয়ে মাটি কেনা যায় না। টাকা দিয়ে কিনে মাটিকে বিনষ্ট করার অধিকারও কারোর নেই। আর একটি উপায় হচ্ছে ইট তৈরি এবং শিল্পস্থাপনের কাজে কৃষিযোগ্য জমি ব্যবহার আইন করে বন্ধ করা।

মাটির নানারকমের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

বহুবিধ উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে মাটির অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কয়লা খনন, অধাতব ও ধাতব বস্তুর খনন, ক্রটিপূর্ণ জলনিষ্কাশনের ফলে জলমগ্নতা ইত্যাদির ফলে জমির কার্যকারিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় থাকে না। খননকর্ম আরম্ভের পূর্বে যদি উপরের স্তরের মাটি সরিয়ে নিয়ে গেলে অথবা খননের পর ঐ মাটির দ্বারা ভরিয়ে দেওয়া যায়, অথবা জলনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায় তা হলে অনেক ক্ষেত্রে ঐসব মাটিকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিক বাঁচানো যেতে পারে।

আরও যেসব ক্ষেত্রে মাটিকে পুড়িয়ে বিস্তৃত আকারে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে কয়েকটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, বাসনপত্র, পটচিত্র, মূর্তিবিগ্রহ, জলনিকাশী নল, ছাদের জন্য টালি ইত্যাদি তৈরি। এই সব দ্রব্যাদি তৈরি করতে যে বিশেষ ভৌতধর্ম আবশ্যক তা পাওয়া যায় সেই সব মাটিতে যাদের কাদা অংশে কেয়োলিনাইট মিনারেল-এর পরিমাণ বেশি। একমাত্র এই রকম মাটির দ্বারা তৈরি দ্রব্যাদিই উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা করলে অটুট থাকে।

বর্জ পদার্থের আশ্রয়স্থল মাটি

অপ্রয়োজনীয় ময়লা বর্জপদার্থ মাটিতে নিক্ষেপ করা কিম্বা পুঁতে দেওয়ার অভ্যাস অনেক পুরানো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন প্রকল্পাদির প্রসারের সাথে বর্জপদার্থের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যও বেড়ে চলেছে। তরলবর্জের ক্ষেত্রে মাটির গ্রথন ও গঠন এমন হতে হবে যাতে নিষ্কাশন ব্যাহত না হয়। উপরন্তু মাটির সঙ্গে সংযোগ সময় এমন হতে হবে যাতে মাটি দ্রবণীয় দূষণকারী পদার্থগুলিকে ধরে রাখতে পারে। অতএব মাটি দোঁআশের কাছাকাছি হলেই সবদিক বজায় থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে নিষ্কাশিত জলের জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা (বি. ও. ডি) যথেষ্ট কমে, অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ থিতিয়ে পড়ে, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস যৌগাদি এবং ক্লালসিয়াম আয়ন ইত্যাদি মাটিতে আবদ্ধ হতে পারে এবং রোগের বীজাণুও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সাবান, ডিটার্জেন্ট-এর সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে কাদামাটি ফেঁপে ওঠে, ফলে জলনিষ্কাশনের ব্যাহত হয়। আয়রন সালফারের বিক্রিয়া করে আয়রন সালফাইড তৈরি করে এবং মাটির ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়, ফলে জল নিষ্কাশন শ্লথ হয়ে পড়ে অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

কঠিন বর্জ পদার্থ যাতে পরিবেশ দূষণ করতে না পারে তার জন্য মাটির গভীরে পুঁতে দেওয়ার রীতি বহু পুরানো। যাতে মাটির তলা থেকে জল ঢুকতে না পারে তার জন্য গর্তের দেওয়ালে এবং তলায় কাদা মাটির লেপন দেওয়া দরকার। মাটির পক্ষে বর্জ পদার্থের দূষণ মুক্ত করার ক্ষমতা সীমিত। অতএব বর্জ পদার্থের পরিমাণের উপর বিচার করে একাধিক গর্তের ব্যবস্থা করা উচিত।

কাদা মিনারেল-এর মধ্যে মন্টমরিলনাইট, আটাপুল-গাইট এবং আংশিক ভেঙ্গে যাওয়া ইলাইট তেজস্ক্রিয় বর্জ পদার্থকে ধরে রাখার পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অনুঘটকের কাজে কাদা মিনারেল

রাসায়নিক বিক্রিয়াদির গতি হার ত্বরান্বিত করতে অনুঘটক ব্যবহৃত হয়। গ্যাসীয় বিক্রিয়ার চাপ ও তাপমাত্রা কমাতেও অনুঘটক সাহায্য করে। সর্বপ্রকার শিল্পরূপায়ণে অনুঘটকের অবদান অনস্বীকার্য। নানারকম গুণসম্পন্ন নতুন নতুন অনুঘটক তৈরির জন্য শিল্পগোষ্ঠীর গবেষকদের বিরাম নেই। প্রকৃতপক্ষে অনুঘটক তৈরিই একটি বিরাট শিল্প হয়ে উঠেছে।

কাদা মিনারেলদের মধ্যে মন্টমরিলনাইট হ্যালয়সাইট এবং কেয়োলিনাইট অনুঘটকের কাজে সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাজের জন্য মিনারেলগুলিকে আয়ন বিনিময়ের সাহায্যে H^+-সম্পৃক্ত করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে অনুঘটকদের সক্রিয় করা হয়। অনুঘটক হিসাবে সেইসব তৈরিবস্তুই কার্যকরী যাদের পৃষ্ঠতলের বর্গক্ষেত্র বেশি, যথেষ্ট ফাঁপা অতএব ঘনত্ব কম। কাদা মিনারেল থেকে তৈরি অনুঘটকের এই

সব গুণ থাকার দরুণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেমন, পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন থেকে ক্ষুদ্রতর আণবিক ভরযুক্ত যৌগ তৈরি করা, তেলের ময়লা, অবাঞ্ছিত রঙ এবং আর্দ্রতা দূর করা এবং নানারকম জৈব বিক্রিয়া সংঘটিত করা।

ভূগর্ভস্থ তেল আহরণে কাদামাটি

পেট্রোলিয়াম তেল প্রধানত ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে জমা থাকে। উপরে তুলে আনতে পাথর কেটে ঐ তেলের স্তরে পৌঁছতে হয়। এই জন্য একটি স্টিল দণ্ডের একদিকে পাথর কাটার ব্লেড জুড়ে দিয়ে একটি স্টিলের নলের মধ্যে রাখা হয়, যাতে নলের ভিতরে খালি জায়গা থাকে। এই খালি জায়গায় 1-2% স্মেকটাইট মিনারেল-এর জলীয় প্রলম্বন ঢেলে দেওয়া হয়। এই প্রলম্বনে অতি অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম লবণ প্রয়োগ করা হয়। এই প্রলম্বনটির বিশেষ গুণ এই যে পাথর কাটার সময় এটি তরল অবস্থায় থাকে কিন্তু বন্ধ করলেই অল্পসময়ের মধ্যে প্রলম্বনটি আধাতরল-আধা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রলম্বনটি পাথর কাটার সময় স্টিল দণ্ডটির গতি মসৃণ রাখে এবং ঘর্ষণজনিত তাপ কমিয়ে দেয়। প্রলম্বনটির ঘনত্ব এমন যে ভেঙে যাওয়া পাথরের অংশগুলিকে উপরে ভেসে আসতে সাহায্য করে নইলে কাটার যন্ত্রটির গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রলম্বনটির তুলনায় হালকা তেল নলের খালি জায়গায় জমা হতে থাকে এবং ক্রমশ উপরে চলে আসে। প্রচুর পরিমাণ স্মেকটাইট প্রলম্বন ঘনবরত নলের মধ্যে ঢেলে যেতে হয় যতক্ষণ পাথর কাটার কাজ চলতে থাকে। এই কাজের উপযুক্ত স্মেকটাইট আমাদের দেশের কয়েকটি রাজ্যে খনিজ হিসাবে মজুত আছে।

অন্যান্য বিবিধ ব্যবহার

কাদা মিনারেল-এর অন্যান্য কয়েকটি ব্যবহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জৈব যৌগ থেকে সালফার দূর করা; তেলে অবস্থিত সামান্য জল ও অম্লবস্তু দূর করা; ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির বহু ব্যবহৃত তেলকে পরিশ্রুত করা; কাগজজাত দ্রব্যাদির জন্য বিশেষ আঠা তৈরি করা; বিদ্যুৎ এবং আর্দ্রতা-রোধী বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি কাদামাটির চাদর তৈরি করা; বিয়ার ও মদ্যাদি পরিশ্রুত করা। তা ছাড়া আছে প্রসাধনের পাউডার তৈরিতে টাল্‌কের ব্যবহার ; সিমেন্ট-মর্টার ইত্যাদিতে মিশ্রণ রূপে ব্যবহার ; কাগজ এবং বস্ত্রাদিতে ফিলার এবং রবার তৈরিতে প্ল্যাস্টিসাইজার হিসাবে কেয়োলিনাইট, আটাপুলগাইট ও মন্টমরিলনাইট-এর বহুল প্রয়োগ পাকস্থলীর অম্লত্বরোধে এবং কীটনাশক দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশ্রণ হিসাবে কেয়োলিনাইট-এর ব্যবহার ; ফটকিরির সাহায্যে জল পরিশ্রুত করার কাজে কেয়োলিনাইট ও মন্টমরিলনাইট-এর ব্যবহার। □

(সমাপ্ত)

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে জার্মেনি বৃত্তান্ত

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

এই শতাব্দীর গোড়ায় য়ুরোপের নানা দেশে এক ঝোঁক দেখা দিয়েছিল পূর্ব দেশকে জানবার জন্য — পূর্ব দেশ অর্থাৎ এশিয়া, বিশেষ করে ভারতবর্ষ এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং কিয়ৎ পরিমাণে চীন। এই অনুসন্ধিৎসার পিছনে যে কারণই থাক, ক্রমে এই আগ্রহ প্রায় আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। জার্মেনির ম্যাক্সমূলর থেকে বলা যেতে পারে এর শুরু এবং ফরাসি দেশের রোমাঁ রলাঁ পর্যন্ত এর বিস্তার। ম্যাক্সমূলর যদিও প্রয়াত হয়েছেন ১৯০০ সালে অর্থাৎ গত শতাব্দীতে। ম্যাক্সমূলর বা রোমাঁ রলাঁ ভারতপ্রেমিক ছিলেন বটে ; তবে এরা কেউ ভারতবর্ষে আসেন নি। ম্যাক্সমূলর ২৩ বছর বয়সে লণ্ডনে বসবাস শুরু করেন ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে। সেখানে থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে ঋগ্‌বেদ সম্পাদনা শুরু করেন। ম্যাক্সমূলর ইংলন্ডে বসেই সমসাময়িক ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে খবরাখবর রাখতেন, অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর নানা সূত্রে যোগ ঘটেছিল। ম্যাক্সমূলরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে না হলেও পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন জার্মান সাহিত্যিক এশিয়া পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন — হেরমান হেস্‌সে এবং স্তেফান জোয়াইগ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষের মানুষের যদিও য়ুরোপ সম্বন্ধে আগ্রহ এর কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বাণিজ্যসূত্রে য়ুরোপের সঙ্গে যোগাযোগের পর য়ুরোপের খবর অল্পস্বল্প পাচ্ছিলেন, কেউ কেউ য়ুরোপ সম্বন্ধে কৌতূহলীও হচ্ছিলেন। এমন মানুষের সংখ্যা তখন ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। অধিকাংশ মানুষই য়ুরোপীয় অভিঘাত থেকে ঘর সামলাতে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, অক্ষুণ্ণ অম্লান রাখতে কোমর বেঁধেছিলেন। যাঁরা য়ুরোপ সম্বন্ধে যথার্থ আগ্রহী হয়েছিলেন রামমোহন রায় তাঁদের পথিকৃৎ। এই পথেই এলেন রবীন্দ্রনাথ। এঁরা নবীন য়ুরোপের যুক্তিবাদ, উদারতা, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বিরোধিতার প্রতি সপ্রশংস ছিলেন। এসব কথা এদেশের মানুষকে বারে বারে শুনিয়েছেন নানা উপলক্ষে। এবং এই আগ্রহেই এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চিমে নানা কারণে পাড়ি জমিয়েছেন। রামমোহন সেখানেও পথিকৃৎ। রামমোহনের প্রভাবে সাহস পেয়েছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, যিনি দু-দুবার বিলেতে গেলেন এবং সেখানেই প্রয়াত হলেন। পরিবারে বিদেশ ভ্রমণের ধারাটি তিনি তৈরি করে দিয়ে গেলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিলেতে যান নি, যদিও জাহাজে চড়ে একবার চীনদেশে গিয়েছিলেন খুব অল্প দিনের জন্য। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বিলেতে না গেলেও পুত্রদের জন্য অন্তত দুজনকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন প্রায় তাঁদের কিশোর বয়সেই। দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ফিরেছিলেন 'মানুষ' হয়ে অর্থাৎ আই.সি.এস হয়ে, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে 'মানুষ' হয়ে ফেরেন নি। তাঁর কপালে ব্যারিস্টার বা আই. সি. এস. কোনোটাই ঘটে নি। তবে রবীন্দ্রনাথের এই পাশ্চাত্য ভ্রমণ তাঁর পরবর্তী জীবনভাবনার উপর একটা বড় মাপের ছাপ ফেলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে কয়েকবার বিলেতে গেছেন। কিন্তু তাঁর মনে সে ছাপ কতদূর পড়েছিল বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুদূরের পিয়াসী' মন নিয়ে বারে বারেই দেশের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছেন। ফলে তাঁর চিন্তাভাবনা সমৃদ্ধ হয়েছে নানাভাবে। দেশও লাভবান হয়েছে। পশ্চিমের মানুষেরও পূর্ব দেশকে জানবার আগ্রহ তৃপ্ত হয়েছে। তবে এর ফলে পূর্ব আর পশ্চিমের সব ভুল বোঝাবুঝি চিরতরে ঘুচে গেছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে নানা দেশে গিয়েছেন। সব দেশের ক্ষেত্রে এই ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ আমরা এখনো পাই নি। শুধু ভ্রমণের বিশদ বিবরণই নয়, সে সব দেশে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি বা বিরূপতা অথবা রবীন্দ্রপ্রভাবের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই, তবে অনেকটাই বাকি। কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে বা আনুকূল্যে কাজ হয়েছে যেমন সোভিয়েত রাশিয়া বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। তবে সেগুলিকেও তেমন সম্পূর্ণ বলা যায় না। মার্টিন ক্যাম্পশেন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে জার্মেনি বৃত্তান্ত নিয়ে যে কাজ করেছেন তাও এক অর্থে সরকারি আনুকূল্যে। তাঁর **Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation** গ্রন্থখানি কলকাতা থেকে Max Mueller Bhavan প্রকাশ করেছেন। তবু একাজটির কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রথম যখন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার কথা ওঠে তখন প্রকাশক কুর্ট উল্‌ফ্‌ (Kurt Wolff) যে দুই বিশেষজ্ঞের কাছে ইংরেজি বইটি পাঠিয়েছিলেন তাঁরা দুজনেই বলেছিলেন যে এ কবিতা জার্মান পাঠক পছন্দ করবে না। ফলে বইটি ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, এমন সময় খবর

আসে যে 'গীতাঞ্জলি'র লেখক সে বছর নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। সুতরাং পালটে গেল মতটা। অনুবাদ হল। ১৯১৪ সালে মারি লুই গথেইন (Marie Luise Gothein) - অনূদিত Hohe Lieder বা Sangespher প্রকাশিত হল এবং ভালো বিক্রিও হল। এক বছরে সত্তর হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে তার আগের বছরই অর্থাৎ ১৯১২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জার্মান সাহিত্যিক গেরহার্ট হাউপ্‌ট্‌মান (Gerhart Hauptmann)। তিনি তাঁর পরের বছরের পুরস্কার প্রাপক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোথাও কোনো মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই। যদিও এ নিয়ে আক্ষেপ করা চলে না। কারণ রবীন্দ্রনাথই কি আলোচনা করেছেন কোথাও হাউপ্‌ট্‌মানকে নিয়ে। যদিও তিনি খুশি হয়েছিলেন ১৯২১ সালে য়ুরোপে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের ষাট বছরের পদার্পণ উপলক্ষে প্রেরিত অভিনন্দন বাণীতে হাউপ্‌ট্‌মানের নাম ছিল জেনে। ১৯১৩ সালে যে একজন ভারতীয় লেখক নোবেল পুরস্কার পেলেন এটা জার্মেনিতে অনেকেই ভালো মনে মেনে নেন নি। তার একটি কারণ অস্ট্রীয় লেখক পিটর রোসেগ্গরের (Peter Rosegger) সে বছর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে সে দেশে ভেবেছিলেন অনেকে। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি পত্রিকায় কার্টুন ছবি এঁকে বলা হয় যে এর পরের বছর উত্তর মেরু যাত্রী আমুণ্ডসেন কোনো এস্কিমো কবিকে নোবেল পুরস্কার দেবেন অর্থাৎ তাঁদের কাছে এস্কিমো কবি আর বাঙালি কবির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে এও মনে রাখা দরকার যে যত সংক্ষিপ্ত বা ক্রটিপূর্ণ তথ্যে ভরাই হোক-না কেন বার্লিন থেকে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত পল ক্রেমারের (Paul Cremer) ৪৮ পৃষ্ঠার রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থটিকে য়ুরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ইংরেজি গীতাঞ্জলির জার্মান অনুবাদ যদিও করেছিলেন মারি লুই গথেইন। তাঁর অনুবাদ কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরও প্রকাশক কুর্ট উল্‌ফ্‌ চেষ্টা করেছিলেন রিল্‌কেকে রাজি করাতে গীতাঞ্জলি তর্জমার জন্য। তা যদি হত তাহলে গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদক যেখানে আর্দ্রে জিদ, সেখানে জার্মান অনুবাদক হিসেবে আমরা পেতাম রায়নার মারিয়া রিল্‌কেকে (Rainer Maria Rilke)। নীট্‌শের ভাবিশষ্য টমাস মান (Thomas Mann) স্বীকার করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের জার্মান অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই গড়ে ওঠে নি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ 'মহান' হতে পারেন। তবে তিনি একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলার মতো মনে হয়েছিল, সে কি তাঁর পোশাক দেখে না কণ্ঠস্বর শুনে? ইংরেজি ভালো না জানার অজুহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়েও গিয়েছিলেন সাক্ষাৎকারের পরের মুহূর্তেই। রিল্‌কেও অসন্মত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করতে। আর টমাস মান তো বাক্যালাপ করতেই চান নি। হেরমান হেস্‌সের (Hermann Hesse) সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় তিন পুরুষের। অথচ তিনিও গীতাঞ্জলিতে তেমন নতুন কিছু পেলেন না ভারতীয় ভাবনার সঙ্গে প্রতীচ্য প্রভাবের মিশ্রণ ছাড়া। 'গার্ডেনার' পড়েও তিনি অবাক হলেন এই ভেবে যে এমন কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা রাফায়েল-পূর্ব ইংরেজ মনস্থিতার অধিকারী না হয়ে ভারতীয় হলেন কী করে। আর এমন অযোগ্য কবিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলই বা কী করে। তবে হেস্‌ 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় ইংরেজি উপন্যাস ধারার স্মৃতিবহী বা পদাঙ্কানুসারী দেখে খুশিই হয়েছিলেন।

স্তেফান জোয়াইগকে (Stefan Zweig) ভারতবর্ষের গোয়ালিয়র বা বারাণসী তেমনভাবে টানে নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' গ্রন্থ তাঁকে অভিভূত করেছে। এমন মানুষ যে এখনও এই ধরাধামে আছেন একথা ভেবে তিনি উৎফুল্ল। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতামতের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ তেমন নেই।

উইনটারনিজ (Winternitz) ঠিক এঁদের মতো নন। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অধ্যাপনাও করেছেন। কবিকে দেশেছেন অনেক কাছের থেকে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখেছেন তিনি। তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রভূত প্রশংসা করেছেন উইনটারনিজ। ইতিপূর্বে ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদে পাওয়া যায় নি। উইনটারনিজের এমন স্মৃতিকথা থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার সঙ্গে প্রভাতকুমার প্রদত্ত তথ্যের সামান্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। উইনটারনিজ ১৯২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' অভিনয় দেখেন। প্রভাতকুমার লিখছেন নাটকাভিনয় হয়েছিল আলফ্রেডে।

জিমারের (Zimmer) মতো ভারতত্ত্ববিদ যদিও উনটারনিজের মতো রবীন্দ্রসান্নিধ্যের সুযোগ পাননি তবু জিমার যে সময় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জার্মান ভাষায় লিখছেন তখন জার্মেনিতে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তাই জিমার যখন রাজা বা 'The King of the Dark Chamber-এর জার্মান অনুবাদ আলোচনাসূত্রে বৌদ্ধজাতকের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের বিষয়বস্তু তুলনা করতে গিয়ে ঋগ্‌বেদের পুরুরবা-উর্বশী উপাখ্যান

বা শতপথ ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন তখন জিমারের সমগ্র রচনাটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আবার কবে কোন গবেষক সমগ্র রচনাটি ইংরেজি বা বাংলায় আমাদের দৃষ্টিগোচর করবেন, জানি না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচিত প্রায় সব তথ্যই পাওয়া গিয়েছে মার্টিন কাম্পশেনের বই থেকে। সুতরাং বলাতেই হয় যে তাঁর বই না বেরলে কত তথ্যই আমাদের অজানা থেকে যেত। মার্টিন বই লিখেছেন ইংরেজিতে। ইংরেজিতে জার্মান নাম লেখার সুবিধা আছে, উচ্চারণ পাঠকের দায়। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে স্বভাবতই একটা বিপদ দেখা দেয়। তাই যতদূর সম্ভব বন্ধনীতে ইংরেজি বানান রাখতে হয়েছে। তবে স্বয়ং লেখকের নামের উচ্চারণই বা কী জানি না — ক্যাম্পশেন বা কেম্পশেন? রবীন্দ্রনাথ এবং জার্মেনি প্রসঙ্গে এসব তথ্যপঞ্জী গবেষকদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় বলে বোধ হবে। প্রায় কুড়ি জন জার্মান লেখক ও পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মার্টিন জার্মেনিতে রবীন্দ্রচর্চার আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার সঙ্গে সংযোজিত করেছেন রবীন্দ্রগ্রন্থের জার্মান অনুবাদ, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে জার্মান পণ্ডিতদের যাবতীয় রচনার এক সযত্নপ্রস্তুত পঞ্জী। এই পঞ্জীতে তিনশোর অধিক গ্রন্থ বা রচনার উল্লেখ আছে।

এমন সযত্নপ্রস্তুত গ্রন্থে সামান্য ত্রুটি দেখলেও কষ্টের কারণ ঘটে। ধরা যাক, ব্রেস্ট্‌ — এর 'গার্ডেনার'-এর সমালোচনা কবে কোথায় বেরিয়েছে তা জানতে গেলে সমস্ত বইটা উল্টে পাল্টে রীতিমতো গবেষণায় বসতে হবে। অন্যত্রও এমন ত্রুটি আছে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জার্মান লেখক বা জার্মান পণ্ডিতদের অধ্যায় দুটিতে লেখক বা পণ্ডিতদের নাম কোন্ পদ্ধতিতে পর পর সাজানো বোঝা গেল না — না কালানুক্রমিক, বা বর্ণানুক্রমিক। ৩৯ পৃষ্ঠায় হেরমান হেস্‌সে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে কালিদাস নাগ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছাত্র — কী অর্থে? ১৭ পৃষ্ঠায় একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপির নীচে উল্লেখ আছে যে ১৯১৪ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত পল ক্লেমারের বইটি য়ুরোপীয় কোনো ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী, আবার ৮২ পৃষ্ঠায় আছে পল নাটর্পের (Paul Natorp) **Studen mit Rabindranath Thakkur** জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা প্রথম বই। বইটি ১৯২১ সালে জেনা থেকে প্রকাশিত। দুটি তথ্যের মধ্যে একটা সংশয় রয়ে গেছে। উইনটারনিজের স্মৃতিকথায় আছে (পৃ ৮৭) দিনেন্দ্রনাথ কবির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্টেলা ক্রামরিশের প্রসঙ্গে যেখানে বিবরণ আছে সেখানে মার্টিন সঠিকভাবে দিনেন্দ্রনাথকে কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র বলেই উল্লেখ করেছেন (পৃ ১০২)। উইনটারনিজের ভ্রান্তি হতে পারে, মার্টিন সেটা সেখানে পাদটীকায় সংশোধন কি করতে পারতেন না? যেমন 'সাধনা' র বানান প্রসঙ্গে করে দিয়েছেন তৃতীয় অধ্যায়ের ৬০ সংখ্যক পাদটীকায় (পৃ ৭১)। বইটি সযত্নে ছেপেছেন গ্রাফিটেক ইণ্ডিয়া প্রায় নির্ভুলভাবে, একটি মুদ্রণবিচ্যুতি চোখে পড়ে ৯৮ পৃষ্ঠায় যেখানে 'he' হয়েছে 'be'।

মার্টিনের বই পড়তে পড়তে আরও অনেক তথ্য জানতে কৌতূহল জাগে। নাটর্পের স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর (১৭.৪.১৯২৪) রবীন্দ্রনাথকে যে অসাধারণ পত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর কোনো উত্তর দেন নি? স্টেলা ক্রামরিশ এখন কোথায়, কেমন আছেন? * বইটিতে বেশ কয়েকটি বাঙ্চিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটির নীচে লেখকের মন্তব্য আছে, তবে শেষ মলাটের বাঙ্চিত্রের ব্যাখ্যা অস্পষ্টভাবে রয়েছে ১৮-১৯ পৃষ্ঠায়। জানবার কৌতূহল তাতে সম্পূর্ণ মেটে না।

রবীন্দ্রনাথ আর জার্মানির কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আইনস্টাইনের কথা মনে আগে। লেখকেরও সে কথা মনে এসেছে নইলে মলাটে আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের Religion of Man গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন কথোপকথন রয়েছে সে খবরটুকু মূল গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে না। তার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের ১১৭ সংখ্যক পাদটীকার 'See the Bibliography' এই নির্দেশ অনুসরণ করে হাতড়াতে হাতড়াতে Bibliography -র ৩২ সংখ্যক তথাসূত্রে ব্যাপারটা পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ ধরা পড়বে, কিন্তু তাতে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে কি? গ্রন্থটির শুরু হয়েছে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরকে অবলম্বন করে। তবে ভারত-জার্মান যোগসূত্রের কথা উঠলে ম্যাক্সমূলরকে স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে। বিশেষত ম্যাক্সমূলরের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের যোগ ঘটেছিল আর রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন, "মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য', সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য" অধিকন্তু বইটি ম্যাক্সমূলর ভবন থেকেই প্রকাশিত।

মার্টিনের এই গবেষণাকার্য তবু উল্লেখযোগ্যতা হারাবে না।

☆ সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে স্টেলা ক্রামরিশের মৃত্যু ঘটেছে আমেরিকায়।

স্তেফান জোয়াইগের আস্থা ছিল না মুনিকের বৃহৎ সংবাদপত্রে যখন রবীন্দ্র বন্দনায় ভেসে যাচ্ছিল, তাকে তিনি বলেছেন 'hollow jokes' বরং ১৯৫৭ সালে হেরমান হেস্‌সে যখন বলছেন, 'পশ্চিমে আজকের খ্যাতিমান ব্যক্তিরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তে মিলিয়ে যান, আবার কালের বাবধানে তাঁদের পর্যালোচনা শুরু হয়, কেনই বা তাঁরা খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন, আর কেনই বা তাঁরা পরে হারিয়ে গেলেন,' সেই উক্তির মধ্যে একটা অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে। বইতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'Other Tagore' বা মার্টিনের Whole Tagore -র প্রসঙ্গের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

RABINDRANATH TAGORE and GERMANY A DOCUMENTATION, Martin Kämpchen Max Mueller Bhavan, Goethe Institute, Calcutta 1991, 100.00

স্বররক্ষণ যন্ত্রের আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং রবীন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

এই বইটির বিষয় গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের গান, আবৃত্তি ও ভাষণের আনুপূর্বিক ইতিহাস। সেই সঙ্গে অন্যের গাওয়া গানের তালিকা এবং এ দেশে কলের গান বা গ্রামোফোনের প্রবর্তনের আনুপূর্বিক বিবরণ। ইতিপূর্বে লেখক সন্তোষকুমার দে 'কবিকণ্ঠ' নামে বই প্রকাশ করেছিলেন। এটি তার বৃহত্তর এবং পূর্ণাঙ্গতর রূপ। আমি যতদূর জানি বাংলায় এই বিষয়ে বই তুলনারহিত না হলেও অনন্য।

এ ধরনের বই লেখার এক বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। এ তো শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসবিচারমূলক আলোচনা নয়, কিংবা রেকর্ডে ধরে রাখা রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা নয়। এ দেশে গ্রামোফোন প্রবর্তনের সূচনাকাল থেকে টেপ প্রথা প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত কবিকণ্ঠ প্রচারিত হওয়ার প্রযুক্তিগত, ব্যবসাগত এবং শিল্পগত বিবরণ। প্রযুক্তি, ব্যবসায় এবং শিল্প — এই তিনদিকের খুঁটিনাটি সংবাদ একসঙ্গে রাশেন এমন মানুষ বিরল। একেবারে নেই — একথা বলে লেখককে অপ্রস্তুত করতে চাই না, তবে লেখক সন্তোষকুমারের মতো সুজ্ঞাত কোনো সাহিত্যিকের এই বিশেষ অনুসন্ধানে সারা জীবন ধরে ব্যাপৃত থাকার মতো দৃষ্টান্ত যে প্রায় নেই, এ কথা স্বীকার্য। সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কিছু কিছু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁর জীবিকার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির কোনো যোগ নেই। আমরা তাঁদের সাহিত্যিক পরিচয়টাই জানি। সেটাই সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ছিলেন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনটেন্ট। কবিতায় তাঁর এই বৃত্তির কোনো চিহ্ন নেই। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন ইনজিনীয়ার। আমরা অবশ্য তাঁর কবিতা পড়বার সময় বলতে চাই ইনজিনীয়ারের দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎতের সমস্যা সন্ধান করতে চেয়েছিলেন।

সন্তোষকুমার দে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচারবিভাগে কাজ করতে গিয়ে গ্রামোফোনের যন্ত্রীয় ইতিহাস, তাঁর ব্যবসায়ের নানাদিক সম্পর্কে স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন করে জীবনের সায়াহ্নে বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত। কিন্তু তাঁর মৌলিক প্রবণতা সাহিত্যিকের। গল্প উপন্যাস কবিতা লিখে তিনি আজ সর্বজনপরিচিত। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে সন্তোষকুমার তাঁর সাহিত্যিক প্রবণতাকে তাঁর জীবিকাবৃত্তির সঙ্গে সমন্বিত করে বাংলা সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন পথনির্দেশ করলেন। তাঁর বই পড়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কত দিক নিয়ে কাজ হয়েছে, এ কাজটিরও কতখানি প্রয়োজন ছিল, অথচ যোগাযোগের অভাবে সেভাবে এতকাল কেউ এগিয়ে আসেন নি। আমাদের পক্ষে বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ষোল বৎসর (১৮৭৭) তখন ফোনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখবার এই প্রয়াসের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী হয়েছে বিশ্বের নানা ক্ষেত্রে, নানা উপলক্ষে, নানা প্রসঙ্গে। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন থেকে কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন, তখন থেকেই এই যন্ত্রের সৃষ্টি এবং ক্রমোৎকর্ষ। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর প্রথম ধরা পড়ে ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে। সন্তোষকুমার জানিয়েছেন "উৎসাহী গবেষক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৮ সালে) প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে এডিসনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গানই রেকর্ড করেছেন তার লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে 'পরিচারিকা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সালে"।

এটা একটা ঘটনা মাত্র কিন্তু সন্তোষকুমার যে বিশেষ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন, সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এবং ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের এই যোগাযোগ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করছে। কালের দিক দিয়ে পরবর্তী চমকপ্রদ খবর — ১৯০০

থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্ গান রেকর্ড করান। রেকর্ড হয়েছিল সিলিণ্ডারে ; পরে ডিস্কে করিয়েও এইচ বোস তা এ দেশে প্রচার করেন। এই রেকর্ডটিও হারিয়ে গিয়েছিল। সন্তোষকুমারই এটি আবিষ্কার করেন এবং জওহরলাল ও ইন্দিরার উৎসাহে সেটি সংরক্ষিত হল কীভাবে তার চমকে দেবার মতো বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইতে।

বস্তুত 'কবিকণ্ঠ ও কলের গান' বইটি রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রামোফোন মিলিয়ে একটি অভিনব গবেষণা গ্রন্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস লেখবার জন্য তিনি এ-বই লেখেন নি। লিখেছেন মনের আনন্দে স্বাভাবিক কৌতূহল এবং উৎসাহে। স্বীকার করব যে মাঝে মাঝে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিনি যে খবর এবং তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা আমাদের মতো অ্যাভারেজ পাঠকের পক্ষে অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডের সূত্রে সন্তোষকুমার আমাদের দেশে স্বররক্ষণ যন্ত্রের আনুপূর্বিক ইতিহাস দিয়েছেন। আবার এর তথ্য সংগ্রহের জন্য সন্তোষকুমার আমেরিকায় এবং লণ্ডনে গেছেন, জার্মানির প্রত্নশালায় যোগাযোগ করেছেন। তার দুর্লভ ফটোচিত্রে এ বই শোভিত।

চারশত কুড়ি পৃষ্ঠার এই বইতে রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রধানত এর দুটি ভাগ। ভাগ দুটি লেখক চিহ্নিত করে না দেখালেও পাতা উলটে গেলে বোঝা যায়। ১৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নানারূপে কবিকণ্ঠের সংরক্ষণের ইতিহাস। তাতে আছে রেকর্ডে কবিকণ্ঠ, টেপে কবিকণ্ঠ, কলের গান, গ্রাফোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কবির চুক্তি, আকাশবাণী ও কবিকণ্ঠের রেকর্ড, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত, এই পর্যন্ত লেখকের নিজস্ব গবেষণাশ্রয়ী রচনা। তারপরের ভাগ সবটাই তালিকা। এই তালিকা নানা সূত্রে রচিত। গীতিনাট্য, হিন্দুস্থান ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা, মেগাফোন ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা, গাথানি ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা, সাউণ্ড উইং ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা, সোনেক্স ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা পরিচয় ও সি. বি. এস্ ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা (এতে বিবেকানন্দের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত), বাংলাদেশের ক্যাসেটে রবীন্দ্ররচনা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের গান-আবৃত্তি ভাষণের নানাধরনের তালিকা। আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারছি না, লেখকের শ্রমসিদ্ধ এই বিচিত্র তালিকায় কোনো কিছু বাদ পড়ল কিনা। বস্তুত 'কবিকণ্ঠ ও কলের গান' যেন একটি কোষজাতীয় গ্রন্থ। এর কোষ-চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য 'কবিকণ্ঠ' বই সংশ্লিষ্ট নানা মতামত। সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, খবরের কাগজের খবর সবই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ফলে বইয়ের চেহারা হয়েছে একটু এলোমেলো তবে বিষয় হিসাবে তার গুরুত্ব কিছু কম নেই। মাঝখানে সহায়ক গ্রন্থের পঞ্জী আছে যে পঞ্জীও মিশ্র ধরনের।

মানুষের জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি অনুসরণ করলে এর পরিবর্তনের প্রকৃতি চোখে পড়ে। একসময়ে জ্ঞান ছিল সামগ্রিক। আস্তে আস্তে তার বিভাজন শুরু হল, তার শ্রেণীবিভাগ স্পষ্টতর হল, প্রত্যেক শ্রেণী হয়ে উঠতে লাগল স্বয়ংসম্পূর্ণ গভীরতা সঞ্চারী। স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও সবকিছুর সঙ্গে যোগের বন্ধন না বুঝে নিলে চলে না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিরাট চার খণ্ডে রবীন্দ্রজীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সব দিকগুলি ধরে দিতে। আজকালের প্রবণতা হচ্ছে প্রতি খুঁটিনাটি বিষয়কেই চূড়ান্ত করে দেখা। এই প্রবণতারই ফল হচ্ছে সন্তোষকুমার দে মহাশয়ের এই বই। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রামোফোনের যোগটি যতটা সম্ভব চূড়ান্ত করে দেখেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষীকরণ অর্থাৎ Specialised knowledge থাকলেও তার দৃষ্টি সার্বিকতা হারায় নি। কেউ রবীন্দ্রনাথের গানের রসমূল্য বা সঙ্গীতমূল্য নিয়েই কাজ করেছেন, কেউ রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কাজ করেছেন, সন্তোষকুমার কাজ করেছেন বিষয় নির্বিশেষে গানের রেকর্ড নিয়ে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথকে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেনি। তিনি মনে রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ যখন মর্তকায়ায় থাকবেন না, যখন অলোকসামান্য পুরুষটি হবেন অতীতে আচ্ছন্ন রূপকথা, তখন রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই দেওয়া সুর নিয়ে সেই মানুষটিকে জীবন্ত করে তুলবে। সুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সুর তো কবির ব্যক্তিত্বের এক একটা মুহূর্তের শব্দচিত্র। কবিকে আমরা জানি সুর আর শব্দের ভিতর দিয়ে। তাতে অবশ্য তাঁর স্থূল জীবনটাকে পাই না। তা জানবার সাধারণভাবে আমাদের দরকার থাকে না, যদিও অন্য কারণে অবশ্যই দরকার। রবীন্দ্রজীবনীর প্রয়োজন সেজন্য, তাই নিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই। এ-বইখানাও রবীন্দ্রজীবনীর সঙ্গেই সম্পর্কিত। 'কবিকণ্ঠ ও কলের গান' বইতে রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড সঙ্গীতের যে বিপুল তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তা জীবনীর পক্ষে যেমন, রসাস্বাদকামী অনুসন্ধিৎসুর পক্ষেও তেমনি। কবি রবীন্দ্রনাথের যে বিভিন্ন মগ্ন উচ্চারণের সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে রসিক চিরন্তন জগতের পথনির্দেশ চান, তার সূত্র তিনি এখানেই পাবেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্হিত হওয়ার পর চিরন্তন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য দেয় এই গান, আর রেকর্ডে সেই কবিকেই বার বার ফিরে পাই।

আমাদের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের সংখ্যা অত্যন্তই কম। আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ সুর বজায় রেখে যে-সব গায়ক গায়িকা রেকর্ড করেছেন, তাদের সংখ্যা অপরিমেয় না হলেও সেই সব শিল্পী প্রবাদপ্রতিম হয়েছেন। তাঁরা কেউ কেউ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাদের শিষ্যানুশিষ্যরাও সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। এরই মধ্যে আবার কোন পথে পরিবর্তনের আভাস ফোটে। সব সময় সে-সম্বন্ধে অবহিত থাকাও সম্ভব নয়। আবার সুর নিয়ে তর্ক-বিতর্কও আছে। রেকর্ডে আমরা তার প্রায় নব্বই বছরের রূপরূপান্তরণ পাচ্ছি। এই পরিবর্তনের কতটুকু টিকবে, কতটুকু খাঁটি থাকবে বলা শক্ত। কিন্তু এক মহাশিল্পীর সুরসৃষ্টির সীমাহীন বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাকে রেকর্ডই ধরে রেখেছে। সন্তোষকুমার দে মহাশয় ভবিষ্যতের অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতার যে-আনুকূল্য করলেন, কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের জগতে প্রবেশের যে-চাবিটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন, তার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন না কে ?

কবিকণ্ঠ ও কলের গান — সন্তোষকুমার দে/গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন/১০০ টাকা

প্রসঙ্গঃ সায়েন্স ফিকসান এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

অন্যভুবন

'এস্টাউন্ডিং স্টোরিজে'র সম্পাদক জন ক্যাম্পবেল একই সাথে লেখক আর পাঠক গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করেছেন দীর্ঘকাল এবং বলা যায়, তাঁরই অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, আধুনিক সায়েন্স ফিকশান— সংক্ষেপে SF। SF রচয়িতাদের জন্য দুটো শর্ত আরোপ করেছিলেন তিনি— ১. অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক তত্ত্ব বা তথ্য পেশ করা চলবে না, ২. সাহিত্য গুণান্বিত হতে হবে। আপাত সরল দুটি শর্ত একই সাথে পূরণ করা বড়ই শক্ত। যেমন শক্ত কাজ ককটেল বানানো বা স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে রসনা তৃপ্তিকারী ব্যঞ্জন বানানো। ছেলেবেলায় মেরী শেলী বা ওয়েলস বা ভার্নের রচনা পড়ার সময় কখনও ভাবিনি তাঁদের রচনা খাঁটি SF কিনা। প্রয়োজন হয়নি। সাহিত্যে যে ব্যাকরণের ভুল খোঁজে তার চেয়ে বেরসিক সংসারে নেই। তা বলে ক্যাম্পবেলকে নিশ্চয় বেরসিক বলা যায় না। একদিকে তিনি তুলে এনেছেন যোগ্য লেখক, অন্যদিকে গড়ে তুলেছেন রুচিমান সচেতন পাঠক। কাজটা সহজ ছিল না। রহস্য গল্প, অ্যাডভেঞ্চার কি গোয়েন্দা গল্পও অনেক সময় SF পংক্তিভুক্ত হতে চায়। ক্যাম্পবেল SF এর সীমানা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি যে সফল অনেকখানি তার প্রমাণ মেলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে SF এর চাহিদা দ্রুত বেড়ে ওঠায়। অন্য কারণও অবশ্য ছিল। মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, সভ্যতার ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়েছে। এসময় SF একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনৈতিক প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে তুলেছে।

সাহিত্যের এমন একটি জনপ্রিয় আধুনিক শাখা, বলতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়— বাংলা ভাষায় প্রায় উপেক্ষিত। বাংলার শেষ সব্যসাচী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্ভবত প্রথম সার্থক SF স্রষ্টা। 'মনুদ্বাদশ' বড়দের জন্য বাংলায় প্রথম SF উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের এক অমর চরিত্র ঘনাদা— ঘনশ্যাম দাস, সেও প্রেমেন্দ্রর সৃষ্টি। অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন ঘনাদা, এখনও! নির্মল হাস্যরসে জারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ দক্ষতা SF — কে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। সেসব গল্প যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করা সত্ত্বেও সমসময়ে শক্তিমান অন্য লেখকরা এ পথে তেমন এগোলেন না। অথচ পাঠকের আগ্রহ ছিল। একটি প্রমাণ : 'আশ্চর্য' পত্রিকার জনপ্রিয়তা। পত্রিকার প্রথম পুজো সংখ্যা নাকি সাত দিনেই ফুরিয়ে গেছিল। সম্ভবত 'আশ্চর্য' পত্রিকাগোষ্ঠীই SF এর পারিভাষিক শব্দ 'কল্প বিজ্ঞান' এর স্রষ্টা। সাত আট বছর টিকেছিল পত্রিকাটি (প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩)। পাশাপাশি, সত্যজিৎ রায় ১৯৬১ — তে ছোটদের জন্য কলম ধরেই আসর মাৎ করলেন। প্রথম দুটো লেখাই SF — বঙ্কুবাবুর বন্ধু, ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী (সন্দেশ— ১৩৬৮)। প্রফেসর শঙ্কুর সৃষ্টি ফেলুদারও আগে। স্বভাবকৃপণ ও আয়েসী লেখক, বয়সের ভারে ক্লান্ত প্রেমেন্দ্রর পর SF এর পতাকা তুলে ধরলেন লেখক সত্যজিৎ। একেবারে একা বললেও ভুল হয় না।

যখন ভাবছি SF এর ধারাটি শুকিয়ে গেল সে সময় হাতে এল হুমায়ুন আহমেদের লেখা আলোচ্য গ্রন্থটি (সায়েন্স ফিকশান

সমগ্র; প্রথম প্রকাশ; বইমেলা ১৯৯০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৯২)।

পূর্বকথায় হুমায়ুন লিখেছেন : এখনও আমায় প্রিয় পাঠ্য তালিকার শুরুতেই আছে সায়েন্স ফিকশান। তারাশঙ্করের 'কবি' পড়ে আমি যে আনন্দ পাই, ঠিক সেই রকম আনন্দ পাই এসিমভের 'এণ্ড অব ইটারনিটি' পড়ে। সম্ভবত আমার মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে।

ভাগ্যিস ! জনপ্রিয় কথাশিল্পী ("ঈর্ষণীয় খ্যাতির অধিকারী"— বেলাল চৌধুরী), বিজ্ঞানের অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদ সাহেবের SF এর প্রতি গাঢ় ভালবাসার কারণেই তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত বইটি একটি SF —"তোমাদের জন্য ভালবাসা", আলোচ্য সংকলনের প্রথম গল্প, বাংলাদেশের প্রথম SF।

আলোচ্য সংকলনে আছে মোট ছ'টি গল্প (গল্প না উপন্যাস সে তর্কে না গিয়ে আমরা সব কটিকেই গল্প বলে উল্লেখ করতে চাই)।

প্রথম গল্পে ("তোমাদের জন্য ভালবাসা") এমন একটা যুগের কথা বলা হয়েছে যে যুগে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় উন্নতি হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের পাশে ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ, নাম যার টাইকা। সে সময় দেখা দিল এক মহাসংকট : "হঠাৎ করে ভোজবাজির মতো **টাইকা** গ্রহটি হারিয়ে গেছে।"

"এই মুহূর্ত থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক স্টেশনে চরম সংকট ঘোষণা করা হল।....

হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বৎসর তিনমাস পনের দিন পর এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে" (পৃঃ ৭)।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। বিশ্বকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা ঘন ঘন বৈঠক করছেন, অঙ্ক কষছেন। রহস্য ভেদ করতে ব্যস্ত রয়েছে কমপিউটার। সমস্যা আর তার সমাধান দুই বেশ চমকপ্রদ। কেমন করে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল পৃথিবী লেখক তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। অল্প কথায় লেখক সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক জগতের বাসিন্দাদের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তারা কেমন দেখতে, কী খায়, বসবাসের ব্যবস্থা সবই জানিয়েছেন। অন্য দিকে, জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে কাল্পনিক সেই জগতে মানুষকে পঙ্গু গিনিপিগও বানানো হয়। — হয়তো কল্পনা। অথবা, বিজ্ঞান যে পথে এগোচ্ছে তাতে সন্দেহ হয়, লেখক বুঝি পাঠককে নিষ্ঠুর এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন এ গল্পে। গল্পের সার্থকতা সেখানেই। কল্পবিজ্ঞানের আকাশ ছুঁয়ে যায় বাস্তবের মাটি।

একটি প্রশ্ন : লেখক লিখেছেন, "শক্তি তো সব সময় অবিনশ্বর নয়, এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানি না কী হয়" (পৃ: ২৫)। পাঠককে এমন ধন্দে ফেলা কেন ? তাঁর প্রায় সব গল্পেই এমন ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

আহমেদ সাহেবের দ্বিতীয় গল্প "তারা তিন জন" লেখা হয় প্রথমটির দশ বছর পর। লী, অমু এবং নীম তিনটি কুৎসিত-দর্শন প্রাণী যাদের এগারটি পা, চারটি 'লুখ' (অ্যান্টেনার মতো কিছু), শরীরের তুলনায় মস্ত মাথা। তারা এক অদ্ভুত পৃথিবীতে বাস করে যেখানে জল নেই, আছে মিথেন ও হাইড্রোজেন। তারা কিছুই খায় না। প্রাণের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কোন উপাদান যে গ্রহে নেই। অন্য এক গ্যালাক্সি থেকে একদল এসেছে তাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। তারা আবিষ্কার করে প্রাণী তিনটি অসম্ভব বুদ্ধিমান এবং অমিত শক্তির অধিকারী। তারা ভয় পায়, কোন ঝুঁকি নেয় না, প্রাণী তিনটিকে নির্দয় ভাবে হত্যা করে।

'নীম ফিসফিস করে বলল, "মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী এত হৃদয়হীন হয় কী করে, কমপিউটার সি ডি সি ?"(পৃ: ৯৯)

সামান্য এক প্রশ্নে পাঠকের হৃদয় কেঁপে ওঠে। কিন্তু

"বিষয়টি আপেক্ষিক। চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ হিসেবে কোন বস্তুর স্থায়িত্বকাল হচ্ছে একটি ত্রৈরাশিক গুণিতক। যার প্রথম রাশিটি একটি আপেক্ষিক রাশি....." (পৃ: ৭৯)।

এরকম অনুচ্ছেদে পাঠক যেন বড় অসহায় বোধ করে। বর্তমান আলোচকের মতো নির্বোধ পাঠকের মনে উঁকি মারে 'হ য ব র ল'-র কাক।

"অন্যভুবন" ভিন্ন স্বাদের রচনা। একটি মেয়ে, নাম তিন্নি, বয়স নয়, অসাধারণ মেধা তার ("সব প্রশ্নের জবাব জানে"), ভালো ছবি আঁকে। তার সব ছবিতেই থাকে অদ্ভুত সব

গাছ—গাছের রঙ হলুদ থেকে লালের মধ্যে, অসংখ্য তার ডাল, ডালগুলি লতানো। তার ছবিতে আর থাকে দুটো সূর্য (দুটো সূর্যের কল্পনা অন্য দুটো গল্পেও পাওয়া যায়)। তিন্নি যে বাড়িতে থাকে সে বাড়িটি গাছগাছালিতে ভর্তি, কিন্তু কোন গাছেই পাখি বসে না (কেন তা কে জানে!)। রেগে গেলে তিন্নি মানুষকে বড় কষ্ট দেয়।

এমন এক অস্বাভাবিক মেয়েকে "সুস্থ" করার দায়িত্ব নিলেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট — মিসির আলি। তিনি লক্ষ্য করলেন, মেয়েটির রয়েছে টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। সে স্বপ্ন দেখে গাছের, গাছের সাথে কথা বলে। কথা হয় জীবন নিয়ে, মানুষ আর গাছের সম্পর্ক নিয়ে।

"একটা গাছ যখন মারা যায়, তখন সারা জীবনে যা জানল— তা অন্যদের জানিয়ে যায়। মানুষের যখন কষ্ট হয়, তখন তাদেরও কষ্ট হয়।.....

ওরা সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সারা জীবনে ওরা যত জ্ঞান লাভ করেছে, এগুলি মানুষকে বলতে চায়। কিন্তু বলার আগেই মানুষ শেষ হয়ে যায়। ওরা বলতে পারে না। এই জন্য ওদের খুব কষ্ট (পৃ: ১৫২-৫৩)।"

তিন্নি কী এমনই এক প্রাণ যে একই সঙ্গে মানুষ এবং উদ্ভিদ ? এমন একটা সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন লেখক। তিন্নি নামের মেয়েটি একটি পুষ্পিত গাছ হয়ে যায় একদিন। পৃথিবীতে আর একটি উদ্ভিদ মানুষ জন্ম নেয়। সে হলো মিসির আলির ছেলে।

এ লেখা পড়ে ভীষণ মন কেমন করে। পিতার মমতা ও উদ্বেগ, বিজ্ঞানের কৌতূহল ও সীমাবদ্ধতা, মানুষের সাথে মানুষের আত্মার বন্ধন এ লেখায় ফুটে উঠেছে— ফুটে উঠেছে এক মরমী লেখকের নির্ভুল স্বাক্ষর।

পরের গল্প "হরিনা"। "হরিনা খুব ভেবেচিন্তে লেখা। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ছবি আঁকতে চেয়েছি। .....ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষ কী অমর হবে ? অমরত্বের কোন অভিশাপ কি তাকে স্পর্শ করবে ?"(পূর্বকথা)।

সেই অমরত্ব যা নিয়ে দেবতা ও দানবে চলে নিরন্তর লড়াই। মানুষও অমৃতের সন্ধান করে অমরত্বের আশায়। অমরত্ব পাওয়া মানুষ কি দেবতা বড় নির্মম, অনুভূতিহীন, যান্ত্রিক, নিষ্ঠুর, বন্ধুহীন, প্রেমহীন।

আণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন চল্লিশজন বিজ্ঞানী। তাঁরা থাকেন নিষিদ্ধ নগরীতে, যা কিনা সুখ-স্বপ্ন দিয়ে গড়া স্বর্গেরও ওপরে। পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি জনসংখ্যাও। এদের সাহায্যের জন্য আছে রোবট আর কমপিউটার। অমর, যাঁরা তাঁরাও মানুষ। অমর হলেন কী করে ?

"আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে পৃথিবীতে অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটল — চল্লিশজন অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী মৃত্যু হরমোন অকেজো করে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরাই এ পৃথিবীতে প্রথম এবং শেষ অমর মানুষ।" (পৃ: ১৯৭)

এরপর জানা গেল অমর মানুষের সংখ্যা কমছে। আত্মহননের পথে চলেছে তারা পরের পর। জীবন তাদের কাছে মনে হচ্ছে ক্লান্তিকর। অমরত্ব পেয়েছে তারা কিন্তু হারিয়েছে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা। তাদের মনে হয়, নিয়ন্ত্রিত পৃথিবী অনেক সুখের। অথচ সেখানে ফেরাও যাচ্ছে না। ওদিকে, কমপিউটার সি ডি সি যেন হয়ে উঠছে প্রতিদ্বন্দ্বী, সহ্য করতে পারছে না অমর মানুষদের। অবশেষে সি ডি সি-র পরিকল্পনা মতো অমর মানুষদের মৃত্যু হল, নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে পড়ল সূর্যের আলো।

একটা অবাস্তব পৃথিবীর ছবি ফোটাতে ঈর্ষা, কৌতুক, প্রেম ইত্যাদি নানাবিধ মশলা হাজির করেছেন লেখক, আবার তা সরিয়েও ফেলেছেন দ্রুত। ছবিতে যেন রং ধরেনি, গল্পের আবহ অনেকটা রূপকথার।

সংকলনের পঞ্চম গল্প : অনন্ত নক্ষত্রবীথি। এক অতি সামান্য ব্যক্তি একদিন মহাশূন্য গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেকটরের কাছে শুনলেন :

"হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মহাকাশযান খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছে। ঐ মহাকাশযানে সাতজন ক্রু আছে। এরা সবাই এক একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও আছে চারটি পি এস ফোর রোবট।.....ঐ মহাকাশযানে আপনিও একজন যাত্রী।"(পৃ: ২৫১)

মহাকাশযান যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই পাঠকও বাঁধা পড়েন রোমাঞ্চের জালে। যাত্রা শুরুর কিছু পরেই দেখা দিল বিপর্যয়। এক অজানা শক্তি বলয়ের তীব্র আকর্ষণে মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। মহাকাশযানে ঘোষিত হয়েছে জরুরী অবস্থা। উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা নেই বলাই ভাল। সেই সামান্য বাক্তিটি কিন্তু টের পেয়েছিলেন বিপদ আসছে। সাধারণ হলেও অসাধারণ তাঁর সহজাত বুদ্ধি, ই এস পি (Extra Sensory Perception?)জাতীয় ক্ষমতা। মহাকাশযানে জরুরী সভা চলার মাঝেই ঘটল বিস্ফোরণ। ধ্বংসের পরেও ইনো (একজন জীববিজ্ঞানী) আর গল্পের "আমি" (সেই সামান্য ব্যক্তি), ঘুম এবং জাগরণের কয়েকটি চক্র পার হয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের তীরে জেগে ওঠে। তাদের এখনকার নিয়ন্ত্রক যারা— একই সঙ্গে এক এবং অনেক (!) — তারা অনন্ত নক্ষত্রবীথির পরিব্রাজক। অসম্ভব তাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা। মাত্র একটি চুল থেকে তারা একটা মানুষকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে। একই মানুষের লক্ষ লক্ষ কপি তৈরী করে একটি গ্রহ ভরে ফেলতে চায় তারা। তাদের কাছে আকুল আবেদন জানায় "আমি", পৃথিবীতে তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য। তারা কথা দেয় ফেরত পাঠাবে এবং সেই সঙ্গে "এখানেও" রেখে দেবে।

আপেক্ষিকতাবাদের বিখ্যাত 'টুইন প্যারাডক্সের' মতো একটা বিভ্রম লেখক কল্পনা করেছেন। "আমি" বার বার জুন মাসে মহাকাশযানে চেপে যায় আর তার দু'মাস আগে, প্রতি এপ্রিলে, ফিরে আসে। পৃথিবী বদলে যায়। প্রেমিকা চিনতে পারে না। "আমি" আত্মহননের পথে যাবার কথা ভাবে, পারে না। না পাবার যন্ত্রণা পাঠককে ছোঁয়ার আগেই গল্প ফুরিয়ে যায়।

সংকলনের শেষ গল্পটি আলোচনার আগে বর্তমান আলোচকের মনে কয়েকটা যে প্রশ্ন জেগেছে তা পেশ করি।—

১. প্রায় সব গল্পই বড় বেশি সংলাপ-নির্ভর। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে গড়া এই সংলাপ। অনেক গল্পকারের এই ভঙ্গিটি বিশেষ পছন্দের। আপাত সরল হলেও এই ভঙ্গিতে ছবি ফোটানো সহজ কাজ নয়। এর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, ফাঁকিও, নয় কি?

২. তৃতীয় ও ষষ্ঠ গল্প বাদে সব গল্পের পাত্র-পাত্রীদের বিদেশী নাম। কেন?

৩. কম্পনহীন শক্তির আধার, দুই সূর্য, ত্রৈরাশিক গুণিতক, চতুর্মাত্রিক জগৎ— এইসব প্রায় অর্থহীন কিছু শব্দ/ বাক্য বাদ পড়লে কোন গল্পের অঙ্গহানি হতো কী?

সংকলনের শেষ গল্প "কুহক"। নিশানাথ চক্রবর্তী তাঁর প্রাক্তন ছাত্র মহসিন সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। মহসিনের ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক। তিনি গেছেন এক্স-রে করাতে। যান্ত্রিক ত্রুটিতে অস্বাভাবিক অকল্পনীয় মাত্রার রেডিয়েশান চলে যায় তাঁর মাথায়। তারপর প্রায়ই তার শরীর খারাপ হয়। জ্বর, মাথার যন্ত্রণা। শুরু হলো এলোমেলো স্বপ্ন দেখা। একদিন নিশানাথবাবু আবিষ্কার করলেন যে, তিনি ইচ্ছেমতো কারও মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে পারছেন, দেখছেন— মানুষের মাথার ভেতরটা কুয়ার মতো। কোন কোন কুয়ো গভীর অন্ধকার, পাপের আশ্রয়। মাথার ভেতর থেকে মন্দ যা কিছু তা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে কারও মাথায় তিনি উঁকি দেন। মৃত্যু আসন্ন নিশানাথ জানেন। একদিন তিনি ঢুকে পড়লেন মহসিন সাহেবের মাথায়। সেখানে যা দেখলেন তার জন্য তৈরি ছিলেন না নিশানাথ। মৃদুভাষী মহসিন সম্পন্ন ব্যক্তি, স্নেহশীল পিতা, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান, স্ত্রীর ভালবাসায় সিক্ত। এমন মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুন করে নেশা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছেন (যদিও খুনের যে ফাঁদ মহসিন পেতেছেন তা বড়ই দুর্বল)। মহসিনের চক্রান্ত নিশানাথ ধরে ফেলেছেন জেনে মহসিন তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুর আগে নিশানাথ মহসিনের মাথায় ঢুকে সেখান থেকে পাপ-আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলেন অনেকটা। নৃশংকে ভুলে যান মহসিন। নিশানাথের মৃত্যুতে শোকার্ত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে মহসিন বলেন:

"আমি তোমাকে ভালবাসি দীপা। এরকম করে কেঁদ না। আমার কষ্ট হচ্ছে।.....

বলতে বলতে সত্যি সত্যি তাঁর চোখে জল এসে গেল। এই পৃথিবীতে চোখের জলের মতো পবিত্র তো আর কিছুই নেই। এই পবিত্র জলের স্পর্শে সব গ্লানি- সব মালিন্য কেটে যায়।" (পৃ: ৩৬০)

ক্যাম্পবেলের মাপকাঠিতে এ গল্পটিও খাঁটি SF কিনা সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু এ গল্প পড়ে যদি কারও চোখে এক ফোঁটা

জল উঁকি দেয় তো বিস্মিত হব না। রসোত্তীর্ণ গল্প ব্যাকরণের বেড়া ভাঙ্গে তো ভাঙ্গুক। "তোমাদের জন্য ভালবাসার" লেখক হুমায়ুন আহমেদ সাহেবের জন্য আমাদের হৃদয়েও পাতা হয়েছে ভালবাসার আসন। আমরা প্রার্থনা করি তার মধ্যে 'গণ্ডগোল' যদি কিছু থাকে তো থাক॥

আপেক্ষিকতা ও আইনস্টাইন

১৯০৫ সালে Annalen der Physik পত্রিকায় প্রকাশিত আলবার্ট আইনস্টাইনের তিনটি প্রবন্ধের একটি: On the Electrodyromics of Moving Bodies, যা পরবর্তী কালে পরিমার্জিত চেহারায় বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নামে পরিচিত হল। তারও প্রায় এক যুগ পরে, ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। হৈ চৈ সারা পৃথিবী জুড়ে যা এখনও থামেনি।

কিন্তু কী সে বস্তু যার নাম আপেক্ষিকতা তত্ত্ব? Scientific American পত্রিকায় প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল (পুরস্কার ৫০০০ ডলার!), তিন হাজার শব্দের সীমায় ব্যাখ্যা করতে হবে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। আইনস্টাইনের সঙ্গীসাথীরা প্রায় সকলেই আসরে নেমেছিলেন, আইনস্টাইন নিজে নাকি সাহস পান নি!

এমন দুরূহ বিষয়ে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন সরকার ('আপেক্ষিক তত্ত্ব পরিচয়; প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ ১৩৯০; মূল্য পঞ্চাশ টাকা)। বইখানা অনেক দেরিতে নজরে এল। কাছাকাছি সময়ে (১৯৮২) প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদও এ বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। এ বিষয়ে আর কোন পাঠ্যপুস্তক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই (স্বয়ং আইনস্টাইনও চমৎকার একটি বই লিখেছেন, নাম Relativity—The Special and General theory. এ দেশে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে বইখানা অনুবাদ করেছিলেন)। অর্বাচীন বাংলায়, আমার মাতৃভাষায়, এ বিষয়ে পুরো একখানা পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য এলেম লাগে। মাতৃভাষাতেও যোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভব আর একবার প্রমাণিত হল। অধ্যাপক সরকারের বইটি আলোচনার আগে, সাধারণ পাঠকের জন্য, আপেক্ষিকতা কী তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি।

ধরুন, ট্রেনে চেপে চলেছেন কোথাও। ট্রেনের জিনিষপত্র আপনার মনে হবে নিশ্চল। কিন্তু বাইরে দাঁড়ানো পর্যবেক্ষকের চোখে ঐ জিনিষপত্র ট্রেনের বেগে ধামমান বলেই মনে হবে। অন্য একটি ট্রেনের যাত্রী (যার বেগ ভিন্ন) বাইরের স্থির পর্যবেক্ষকের মতোই ঐ জিনিষগুলোকে সচল দেখে। কিন্তু তার বেগ সম্পর্কে দ্বিতীয় ট্রেনের যাত্রী আর স্থির পর্যবেক্ষক ভিন্ন মত পোষণ করে। মতের এই গরমিলের কারণ আপেক্ষিক গতি।

এ কথা জানা ছিল অনেকের, সাধারণ অভিজ্ঞতা, আইনস্টাইন শোনালেন নতুন কথা। তাঁর মতে, কোন গরমিলই থাকে না, মতভেদ ঘুচে যায়, যদি গতি হয় আলোর গতির সমান। আলোর বেগ, আইনস্টাইনের মতে, সমস্ত জড় কাঠামোতে এক ও অপরিবর্তনীয় — উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির ওপর তার বেগ নির্ভর করে না। তিনি আরও জানালেন, পদার্থবিদ্যার যাবতীয় নিয়ম সকল জড় কাঠামোতে অভিন্ন থাকে, বিশেষ কাঠামোর কোন অস্তিত্ব নেই।

দু'টি স্বীকার্য গড়ে তুলল একটি তত্ত্ব, নাম যার বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব।

মাত্র ২৯৭ পাতায় বিশেষ ও সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাথে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতেই এই বই। মোট ন'টি অধ্যায়। ছাত্রপাঠ্য সরল ভঙ্গিতে আলোচনা। আলোচনায় যত্নের ছাপ, যথেষ্ট ব্যাখ্যা ও অনুশীলনীর সাহায্যে পাঠককে তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে (কিছু ছাপায় ভুল যদিও বেশ পীড়াদায়ক)। 'প্রশ্নাবলী'ও আছে। বইতে কোন 'ভূমিকা' নেই। কোন পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য তা জানানো হয়নি। অনুমান করা যায় সাম্মানিক স্নাতক পর্যায়ের জন্য। অন্তত ঐ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা এ বই হাতে পেলে খুবই উপকৃত হবে কোন সন্দেহ নেই।

লেখক শুরু করেছেন বলবিদ্যা ও নিউটনীয় আপেক্ষিকতার নীতি থেকে। তারপর ইথার মতবাদ, গ্যালেলীয় রূপান্তরণ ছুঁয়ে এসেছেন লরেনৎস রূপান্তর সূত্রে; তারপর আপেক্ষিকতাবাদ ভিত্তিক গতিবিদ্যা। এই অবধি বেশ গোছানো, সমলয়ে সহজে এগোনো যায়। তারপর যেই মিনকওস্কির চারমাত্রিক ভুবনে ঢুকে পড়বেন (স্থানিক তিন মাত্রা আর সময়ের জন্য চতুর্থ মাত্রা) তখনই যত জটিলতা দেখা দেবে। গাণিতিক ভিত্তি দৃঢ় না হলে এরপর

এগোতে গেলেই হোঁচট খেতে হয় পদে পদে। অধ্যাপক সরকার তা জানেন, তাই, এই প্রসঙ্গে ভেক্টর, টেনসর ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। তবে আরও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ছিল। লেখক গাণিতিক অংশ যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে তা আলোচনা করেছেন।

মিনকওস্কির পর আলোচনায় এনেছে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বকীয় সমীকরণ (আইনস্টাইন একবার আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রেরণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, নিউটন, গ্যালেলিও, ম্যাকসওয়েল আর লরেনৎস না এলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বও আসত না) এবং বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রয়োগ। প্রয়োগ অংশ যথেষ্ট সীমিত।

শেষ দুটি অধ্যায়ে লেখক সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও মহাকর্ষ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতেই বলেছেন, "সার্বিক আপেক্ষিকবাদের আলোচনার জন্য যে গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন তা এই পুস্তকের আওতার বাইরে।" তাও তিনি চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টায় পাঠক খানিকটা উপকৃত হবেন।

অধ্যাপক সরকারের দেওয়া একটি তথ্যে সংশয় আছে। তিনি লিখেছেন,"তিনি (আইনস্টাইন) মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষার ফল (এবং অনুরূপ আরও পরীক্ষার ফল) থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আপেক্ষিকতার নীতিই ঠিক.....''। আইনস্টাইন ১৯০৫ এর আগে মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

ভালো হত যদি আরও কিছু সহায়ক পুস্তকের নাম থাকত। আর বিষয়সূচি নেই কেন? আছে আটপাতা জুড়ে পরিভাষার তালিকা।

সবশেষে পরিভাষা সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। Theory of Relativity-র বাংলা কেউ করেছেন আপেক্ষিকবাদ, কেউ আপেক্ষিকতাবাদ বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, কেউ বা অপেক্ষবাদ (বাউলমন প্রকাশনীর দুটো বই)। হয়তো মনে হচ্ছে, কি আর তফাৎ। কিন্তু পরিভাষা নিয়ে যদি দুই বাংলার লেখকদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে না ওঠে তবে বাংলায় (এপার-ওপার) একদিন সমস্যা দেখা দেবেই। এ সমস্যা সমাধানে দু'বাংলার যোগ্য মানুষেরা এগিয়ে আসুন। দু'পারে দুই বাংলা একাডেমী রয়েছে, তারাও পারে॥

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র/হুমায়ুন আহমেদ/প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৯২/ প্রতীক/ ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০/ ১৮০ টাকা।

আপেক্ষিক তত্ত্ব পরিচয়: মোহাম্মদ তোফাজুল হোসেন সরকার/ প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা/ প্রথম প্রকাশ— জ্যৈষ্ঠ-১৩৯০/ ৫০ টাকা □

কবি এবং কবিতা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবের কবির প্রেম

এ বছর, মায়াকোভস্কির জন্মশতবর্ষ। মায়াকোভস্কিকে শুধু মাত্র কবি বললেই সব বলা হল না। তাঁর নামের এবং কবি অভিধার আগে অনেক ভারি বিশেষণ বসানো হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যাসনানা ছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভূমিতে বিকশিত। নেরুদা বলেছিলেন মায়াকোভস্কির শক্তি, কোমলতা আর ক্রোধ আধুনিক কবিতার জগতে আজও অনতিক্রমা রয়ে গিয়েছে। মায়াকোভস্কি নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে বিপ্লব এবং উত্তাল জনতার অনুষঙ্গ ভেসে ওঠে। এ সত্ত্বেও এই মানুষটি ছিলেন এক নির্জন, ভালোবাসায় উদ্বেল হৃদয়ের অধিকারী। অসম্পূর্ণ জীবনে তিনি কয়েকজন নারীকে চরমভাবে ভালোবেসেছিলেন, তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে সত্যিকারের কিছু ক্ষণস্থায়ী প্রবল ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আর যে-মানুষ উদ্দাম আবেগে নারীকে ভালোবাসার অলৌকিকগুণে অভিষিক্ত হয়ে পৃথিবীতে আসেন, তাঁদের যা অবশ্য প্রাপ্য, মায়াকোভস্কির জীবনেও বারে বারে তা মিলেছে — হতাশা, অবসাদ, বিষাদ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহাশক্তির জীবনের নানা পর্বে যে সব নারী উদিত হয়েছিলেন আর কবির হৃদয়ে-আত্মায়-দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যক্তিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল বারেবারে, পূরবী রায় তার তথ্যসমৃদ্ধ রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন ' মায়াকোভস্কির প্রেম' নামের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকে।

এ বছর জানুয়ারীতে বইটির প্রকাশনাকে কবির জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে বাঙালির মায়াকোভস্কি চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা চলে। লেখিকা রুশ ভাষা জানেন এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত কয়েকবার সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছেন। দেশে বসে কিছু ইংরেজি বই পড়ে তার থেকে মালমশলা আহরণ করে পাঠক-উপভোগ্য প্রেম কাহিনী লেখেননি। ও দেশে গিয়ে মায়াকোভস্কির জীবন এবং প্রেমপর্বের সঙ্গে জড়িত নানা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছেন, রুশ ভাষায় সদ্যতন প্রকাশিত নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ইয়োরোপ আমেরিকার বিশিষ্ট মায়াকোভস্কি বিশারদদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করেছেন। এইখানেই বইটির বৈশিষ্ট্য। বইটিতে পর্বভাগ করে এলজা, লিলি, তাতিয়ানা, ভেরোনিকা আর এলিজাবেথার কথা আছে — তাঁদের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়, প্রেম জমে ওঠা, ভালোবাসার দ্বন্দ্ব সংঘাত, এক নারী থেকে অন্যে অনুরক্ত হয়ে পড়ার দুর্মর প্রবণতা, বিচ্ছেদ বিরহের জ্বালা। কবির বিভিন্ন প্রেমিকা চিঠিপত্রে বা স্মৃতিচারণে মায়াকোভস্কির চরিত্র এবং স্বভাবের নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন। যেমন ভেরোনিকার ভাষায় — সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁর চরিত্রে একটা আতিশয্যের দিক ছিল। আমি কখনো মায়াকোভস্কিকে মাঝামাঝি বা স্বাভাবিক মানসিকতার মধ্যে দেখিনি।

১৯৭৫ সালে লেখিকা মস্কো গিয়েছিলেন এবং কবির প্রধানা প্রেয়সী লিলি ব্রিকের সংগে কিয়ৎক্ষণ সাক্ষাৎ করেন — তখন থেকেই তাঁর মনে মায়াকোভস্কির প্রেম জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। দেশে ফিরে তিনি সেকথা চিন্মোহন সেহানবীশকে জানালে তিনি তাঁকে এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করে লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। লেখিকা রাশিয়ার পুনর্গঠন ও খোলা আবহাওয়ার যুগ শুরু হলে সেখানে আবার যান এবং বিশদ তথ্যানুসন্ধান করার পরে এ বই লেখায় মন দেন। বইটি তিনি চিন্মোহন সেহানবীশকে উৎসর্গ করেছেন।

আশা করি, বইটি অল্পকালের মধ্যে পাঠকসমাজে আদরণীয় হবে এবং এর পরিবর্ধিত সংস্করণ ঘটবে।

অন্য জাতের সংকলন

'অনা মাটি অনা রঙ' নামের কবিতা সংকলনটি প্রকাশ করে রতন বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন। বাংলা ভাষায় এরকম একটি সংকলন ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। সংকলনটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উত্তরপূর্ব ভারতের ষোলটি আদিম জনগোষ্ঠীর ভাষার কবিতা ও গানের সংকলন এই গ্রন্থ। বইটিতে মূল ভাষার কবিতার বঙ্গীকরণ ও ইংরেজি উচ্চারণ এবং বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। ষোলটি ভাষা হল রাভা, সাদরী, মেচ, টোটো, রাজবংশী, নেপালী, লিম্বু, লেপচা, সিকিমি, ভুটিয়া, তিব্বতী, অসমিয়া, গারো, খাসি, মণিপুরি, নাগা এবং মিজো। অর্থাৎ উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসী মানুষের প্রাণের স্পন্দন ধরা রয়েছে এই সংকলনের দুই মলাটের মধ্যে। কাজেই সাহিত্যগত গুরুত্ব ছাড়াও এই সংকলনটি নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ

করবে। বর্তমানে সারা ভারতে দেশের আদি জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনচর্যা সম্বন্ধে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, নৃত্য-গীত, দৈনন্দিন জীবনযাপন, কারুকর্ম বিষয়ে জ্ঞান আহরণের এবং জ্ঞাত বা গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি নথিবদ্ধ করার ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রয়াস চলেছে নানাভাবে। মাত্র কয়েক হাজারের জনসংখ্যায় কোনো কোনো উপজাতি গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেক উপজাতি গোষ্ঠী অবলুপ্তির পথে। তাদের জনসংখ্যা হ্রাস বা অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের একান্ত নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে উঠেছে। রতন বিশ্বাসের মতো দরদী ও পরিশ্রমী মানুষের জন্য আমাদের গর্ব হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি আট বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে লেগেছিলেন এবং এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরেছেন। এখন শিক্ষিত ও বিদ্বান মানুষদের দায়িত্ব তাঁর এই গ্রন্থটি যাতে আদরণীয় হয়ে ওঠে তা দেখা। উপজাতি পাহাড়ি মানুষদের সহজ সরল জীবনচর্যার ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের গান। পাহাড়, ঝর্ণা, গাছগাছালির মতোই পবিত্র এবং অন্তরঙ্গ তাদের উচ্চারণ। প্রকৃতিকে উপজাতিরা আলাদা করে দেখে না — তাদের শরীর সত্তার সঙ্গে অঙ্গীভূত বিশাল, উদার নিসর্গ। যেমন একটি লেপচা গীত — আমাদের জননী কাঞ্চনজঙ্ঘা/বরফে পূর্ণ, শিলা এবং পাথরে মোড়া/আমাদের ভূমি সুন্দর এবং মনোরম/আমাদের গ্রাম নায়ে-মায়েল/দিনের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল/অবশ্যই সকালের প্রথম রৌদ্রের স্পর্শ।/ এটাই আমাদের ভূমি/যার অপর নাম মায়েল/দিনের উজ্জ্বলতা হিমালয় এবং সকল পৃথিবীকে ছুঁয়ে যায়।

একটি মিজো গীতের অংশ ——

অপরূপ সবুজ পাহাড় ও সুন্দর কুয়াশা/আমাদের এই মাটিকে আনন্দে ভরায়।/এই মাটির সৌন্দর্য আর মাধুর্য তার সন্তানদের মনকে স্পর্শ করে।

সাদরী ভাষার একটি চমৎকার কবিতার কয়েক পংক্তি — বয়সকালের সুন্দরী মেয়ে আমার ঘর আলো করে থাকে।/সে আছে বলেই তো ঘরের শোভা/যেমন গাছের শোভা গাছে বসা পাখি।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য বইয়ের শেষে একটি তালিকা রয়েছে — কোন্ জনজাতিগোষ্ঠীর বাস উত্তরপূর্ব ভারতের কোন্ কোন্ জেলায় এবং তারা কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা থেকে জানতে পারি।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন পংক্তিমালা

স্বক্ষেত্রে সফল কিছু ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক অথবা হোমরাচোমরা আমলাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যি রোগ দেখা দেয়। নিজের পেশায় সর্বপ্রকার সাফল্য পাবার পরও কবিরূপে আত্মপ্রকাশের বাসনা তাদের ভেতর দমিত হয় না। হয়তো এজন্য তাঁরা নিজস্ব পেশার জগতে এবং পরিজনমণ্ডলে বাড়তি কদর পেয়ে থাকেন — তার প্রলোভন এড়ানো মুশকিল। আবার এমনও হতে পারে যে তাঁদের কাব্যপ্রেরণা সত্যিই আন্তরিক — ডিগ্রি অর্জন, সংসারযাত্রা, পেশাগত ব্যস্ততার দরুণ জীবনের যে সময়টায় কাব্যদেবীর ক্রীতদাস হওয়ার কথা ছিল তাঁরা তা হতে পারেন নি, কিন্তু মনের টান মরেও মরেনি। জাগতিক সাফল্যলাভের পর তাঁরা কাব্যরচনায় কিঞ্চিত মনোযোগী হয়ে ওঠেন। যে দুর্দান্ত বয়সে কবিতা কোনো যুবাকে উন্মাদ করে তোলে, কিছু কিছু মানুষ সেই উন্মাদনার শিকার না হয়ে সে বয়সে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়ার সাধনায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয় এবং কেরিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের আবার মনে পড়ে কবিতাকে। যখন উন্মাদনায় আক্রান্ত এক সত্যিকারের কবির বছরের পর বছর তার কাব্যগ্রন্থ বের করার সামর্থ্য থাকে না তখন সার্থক পেশাজীবী অ্যামেচারেরা দামি কাগজে সুদৃশ্য মুদ্রণে বাঁধা হয়ে কবিতার বই ছেপে যান পরের পর। কিন্তু কবিতার দেবী কি তাঁদের কাছে ধরা দেন? আমার তো মনে হয় সার্থক বৃত্তিজীবী বিত্তবানদের তিনি পছন্দই করেন না। তাঁদের সঙ্গে ঘর করা তাঁর সয় না। তিনি তাঁদের বৈঠকখানাতে বসিয়ে দুটো কথা বলেই বিদায় দেন, নিজের অন্তঃপুরে হাত ধরে নিয়ে যান না।

এসব কথা মনে হল 'তরু চেয়ে থাকে' এবং 'প্রসন্ন প্রহর' বইদুটি পড়তে পড়তে। প্রথমটির রচয়িতা বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতার পেশাও অধ্যাপনা। বিশ্বনাথবাবু মনে করেন যে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের পর কাব্যজগতে 'এখন খরার পালা' চলছে। পরবর্তী কবিতা সম্বন্ধে তিনি সুচিন্তিত ছন্দোবদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন — 'শব্দেরা সব হারিয়ে গিয়েছে ছন্দ ছাড়া/অকথন যার অশালীন বাণী অলঙ্কারের বাড়া।' রবীন্দ্রনাথের পর যে নতুন কবিতা রচনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল — সেই প্রথম যুগে এমত বিরূপ মন্তব্য আকছার শোনা যেত সাহিত্যের অধ্যাপকদের কাছ থেকে। আজ এত যুগ পরও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এমন বস্তাপচা ছেঁদো মন্তব্য করবেন কখনো ভাবতে পারিনি। অথচ কয়েকজন

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকই না পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে নবযুগ এনেছিলেন!

বিশ্বনাথবাবু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সতেন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণকে নিয়ে পদাগুলি লিখেছেন ভালই — তবে সেগুলি সহ তাঁর এই গ্রন্থের পদাগুলি কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র চেখে দেখবে কিনা সন্দেহ। তবে একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় তাঁর রচিত পদাগুলি পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের নিচু ক্লাসের ছাত্রদের পক্ষে উপাদেয়।

শামসুল হক কোরায়শী তাঁর 'প্রসন্ন প্রহর'-এর কবিতাগুলির আগে একটি মনোরম ভূমিকায় কবিতার বই বের করার নানাবিধ ঝকমারির কথা লিখেছেন। তিনি নিজেই সাদাসাপটা ভাষায় কবুল করেছেন — বলতে কি এসব প্রেমের কবিতা আমার নিতান্ত তরুণ বয়সের লেখা এবং নিছক কল্পনার বিলাসিতা মাত্র। কবির কথায় সে তখন 'পরথম জৈবন' । প্রেমের কবিতা ছাড়া তাঁর বংশের কজন ধর্মপ্রাণ মহৎ ব্যক্তিকে উগসর্গীকৃত কবিতা রয়েছে। একুশে স্মরণে পাচ্ছি কয়েকটি, শান্তির, মুক্তির সপক্ষে কয়েকটি কবিতা। কবিতার ভাষা ও ভাব সহজ, সাবলীল। নিসর্গ চেতনার দিক থেকে তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জীবনানন্দের কাছাকাছি মনে হল।

'কেন ফিরে যাবে' ওয়াজেদ আলির কিছু ছোট কবিতার সংকলন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় তিনি মনের ছোট ছোট সুখদুঃখের ছবি এঁকেছেন। অনেকগুলি কবিতার শেষে '.....' চিহ্ন। যেন হঠাৎ করে কবি ভাষা ফুরিয়ে গিয়েছে অথবা তিনি এর বেশি কিছু বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন বোধ করছেন না। কিন্তু পাতার পর পাতা এরকম পংক্তিনিচয় পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে এগুলিকে কি কবিতা বলা যায়? কবিতাকে ব্যঞ্জনাঋদ্ধ করার চেয়ে এই ধরনকে যেন এক ভঙ্গিপ্রবণতা বলে মনে হয় অথবা পূর্ণ কবিত্বশক্তির অভাব। শব্দে, ছন্দে, চিত্রকল্পে তিনি কোনো বৃহৎ অনুভূতি বা বোধকে রূপ দিতে পারছেন না। তাঁর মননে স্থৈর্য নেই। এইমাত্র সম্বল করে বেশি দূর এগোনো দুষ্কর। তাঁকে সতর্ক হতে হবে এবং এই জাতীয় টুকরো-টাকরা পংক্তি লিখে কবিতা বলে চালানোর প্রলোভন ত্যাগ করে স্থায়ী এবং গভীর বোধসম্পন্ন কবিতা রচনার জন্য পরিশ্রমী এবং ধৈর্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক ফর্মার একটি নিরাভরণ কবিতার বই নিজেই প্রকাশ করেছেন সামসুল হক — প্রক্ষিপ্ত প্রহর। নামহীন চোদ্দটি কবিতা — তির্যক, রূঢ়, নানা ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের উল্লেখে জটিল। আমার ভালো লাগল ২, ৫ এবং ৯ সংখ্যক কবিতা-ত্রয়। ৯ সংখ্যক কবিতাটি তো অসাধারণ। প্রথম পাঠের পর বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। তিনি যেভাবে কথা বলার বা লেখার সাধারণ নিয়মকে ভেঙে শব্দবিন্যাস করেন নিজস্ব আঙ্গিকে, ফলে অর্থ উদ্ধারে এক জটিলতা তৈরি হয়, বাক্যগুলিকে মনে হয় অচেনা — এই কবিতাটিতে তেমন ঘটেনি। এক আভ্যন্তরীণ ছন্দের দুলুনিতে সমস্ত কবিতাটি স্পন্দমান। 'দাম্পত্য বিছানা থেকে দেখা যায় উপাসনালয়/যোগসূত্র নেই তবু দুজনেই দেখি/কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান কল্পনার বাস্তবের তবু'।

'একটি আই-হোল দিয়ে আমি বাইরেটাকে দেখছি/বিস্তৃত-ঘরের ভিতর আরও বিস্তৃত একটি সত্ত-সার' — দিলীপকান্তি লস্কর তাঁর বইতে একটি কবিতায় একথা লিখেছেন। বিরাশিটা কবিতার মধ্যে এইভাবে চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। কিছু কবিতার যৌন অনুষঙ্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ধরনকে মনে আসে যেমন 'অনাহূত' তে 'নদীর বাঁকের মতো উরু যার/লেলিহান ভুরু' কিংবা 'নাভিমূল ছুঁয়ে কবি অনাহূত ব্রহ্মনাম'। এই কবিতার শেষে তিনি জানিয়েছেন পৃথিবীতে অন্নকষ্ট তাঁর কাছে কেবল খবরের কাগজের সংবাদ। মনে রাখার মতো একটি কবিতা হল 'কাক'। ফিমফিনে বৃষ্টির এক বিষণ্ন সকালে একটা বুড়ো কাককে ধনে পাতা আর টম্যাটোর বাগানে ওড়াউড়ি করতে দেখে কবির মনে পড়ছে তাঁর বৎসরাধিক মৃত মাকে কারণ তিনি ও দুটো জিনিষ ভালোবাসতেন। কবিতাগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় লিখিত, সারল্যে ভরপুর।

এক পরম বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর বেদনায় প্রিয়মান শংকর দাশের টুকরো টুকরো কয়েকটি কবিতা। অন্য একটি কবিতায় রয়েছে মায়ের ও দিদির মৃত্যুর উল্লেখ।

সৈয়দ সমিদুল আলমের বইটিও টুকরো টুকরো কবিতার সমাহার। গদ্যে, পদ্যে নানারকম ছাঁদে খন্ডবিখন্ড চেতনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবি। কী তাঁর গূঢ় অভিসন্ধি আমার কাছে স্পষ্ট হল না। দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু কবি তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে একটা অখন্ড সমগ্র রূপ দিতে পারছেন না। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দু-এক পংক্তিতে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছেন। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বাংলা কবিতার যে ঐতিহ্য গড়েছিলেন আজকের কিছু কবি তার সঙ্গে পরিচিত

নন বলে আশংকা হচ্ছে। নতুবা টুকরো-টাকরা পংক্তি রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলতেন না। **'সদর কোঠা'**-র প্রচ্ছদ চমৎকার।

মনভুলানো ছড়া

ছড়ার মধ্যে মজা থাকে, তেমনি আবার ভাবনাচিন্তার কথাও। ছোটদের মনের মতো করে শব্দে ছন্দে সাজিয়ে ছড়ার মালা গাঁথা সোজা নয়। যদিও আপাত নজরে যে কোন ভাষার কালোত্তীর্ণ রসোত্তীর্ণ ছড়াগুলোকে দেখলে বা উচ্চারণ করলে মনে হয় লিখে ফেলা কতোই না সহজ এর মধ্যে আর কঠিন ব্যাপার কী! তাহলে আর একটা সুনির্মল বসু, সুকুমার রায় বা অন্নদাশংকর হয় না কেন?

ছোটদের নানা কাগজে ছড়া লেখার একটা নিয়মিত চর্চা হয়ে চলেছে। কিছু প্রকাশক ছড়ার বই প্রকাশে উৎসাহ দেখান। ১৯৯২ তে প্রকাশিত 'ভুজুং ভাজুং' এবং 'নানা রঙের ছড়া' পড়ে আমাদের ভালো লাগল। 'ভুজুং ভাজুং'-য়ে ছড়াগুলির আলাদা করে নাম নেই। অধিকাংশ ছড়া চারছত্র লাইনের। তাদের মধ্যে — রক্ত নিয়ে খেলছো হোলি, দাদা আমার বড্ড ভালো, কে বলেছে কে বলেছে, চোয়ার পেলে ভুলবে জানি — চমৎকার। ছড়াগুলো সমাজসম্পৃক্ত। হালকা চালে মজার ঢঙে হলেও সমাজের নানা গলদ-গরমিল এদের বিষয়। কিন্তু প্রথম ছড়ার 'ছইড়ে' আর 'কুইড়ে' শব্দদ্বয় আমার বেমানান মনে হয়েছে। ছড়িয়ে, কুড়িয়ে লিখলে কী ক্ষতি ছিল?

' নানা রঙের ছড়া '-এর ছড়াগুলো একদম বাচ্চাদের জন্য, উচ্চারণের দুলুনিতে শিশুরা যাতে মজা পায়। যেমন, 'হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম/চোখ ঘুমঘুম চাঁদ' কিংবা ' ইডলি ধোসা লেবুর খোসা/এই ছেলেটা আস্তুল চোষা' ইত্যাদি। যুগযুগ ধরে মা ঠাকুমাদের মুখে মুখে ফেরা ছেলেভুলানো ছড়ার ছাঁদটা কবি অনুসরণ করেছেন এবং সফল হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী ও নজরুলকে নিয়ে ছড়া রয়েছে।

দুটি ছড়ার বইতেই ছড়ার পাশাপাশি আঁকা ছবিগুলি শিশুদের মনোযোগ কাড়বে। প্রথম বইয়ের ছবি দেবাশিস দেব-এর; পরেরটির বিজন কর্মকারের আঁকা। আশা করি বই দুটি শিশুমহলে ব্যাপক সমাদর পাবে।

মায়াকোভস্কির প্রেম — পূরবী রায়/প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস। ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলি-১৩ / ১৫ টাকা

অন্য মাটি অন্য রঙ — রতন বিশ্বাস/পরিবেশক - দে'জ পাবলিশিং কলি-৭৩ / ১৬ টাকা

তরু চেয়ে থাকে — বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়/পরিবেশক - দে বুক স্টোর, কলি-৭৩ / ৩০ টাকা

প্রসন্ন প্রহর — শামসুল হক কোরায়শী/প্রকাশক — তনভীর কোরায়শী/রাজশাহী/ ৩০ টাকা

কেন ফিরে যাবো — ওয়াজেদ আলি/পরিবেশক — দে বুক স্টোর, কলি-৭৩ / ১২ টাকা

প্রক্ষিপ্ত প্রহর — সামসুল হক/ষাটের দশক, কাকদ্বীপ-২৪ পরগণা / ৪ টাকা

হাওয়ার দেয়াল মেঘের জগদ্দল, — দিলীপকান্তি লস্কর/ প্রকাশক — শ্যামলী লস্কর/করিমগঞ্জ / ২০ টাকা

যেভাবে এসেছি — শংকর দাশ/বিশ্বজ্ঞান, টেমার লেন, কলি-৯ / ৫টাকা

সদর কোঠা — সৈয়দ সমিদুল আলম/প্রকাশক—ছাতিমতলা/ পুকুলিয়া / ৮ টাকা

ভুজুং ভাজুং — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়/রৈবতক, ১৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলি-৭২ / ১০ টাকা

নানা রঙের ছড়া — শৈলেন্দ্র হালদার/পদাতিক - আই/ আই-৬, অশ্বিনী নগর, কলি-৫৯ / ১০ টাকা

বিষয় — বৈদেশিক ঋণ

বেণু গুহঠাকুরতা

বৈদেশিক ঋণ পৃথিবীর অর্থনীতিতে কোন নতুন কথা নয় এদেশেতো নয়ই। বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনীতি সংযোগ এমন স্তরে পৌঁছেছে এবং তা এত বেশি পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল যে, কোন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে তা যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকে আজকাল বড় বড় অর্থনৈতিক শক্তিগুলি আপনস্বার্থেই আগ্রহশীল। যেমন ধরুন পৃথিবীর মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের প্রতি সাতজনের একজন ভারতীয় অতএব ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বিপর্যয় শুধু ভারতীয়দের জীবনেই বিপদের সৃষ্টি করবে না তার ছায়া বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়তে বাধ্য।

ঠিক এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই অর্থনৈতিক সংকটকে একটা মাত্রার মধ্যে ধরে রাখার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এতগুলি ঋণদান সংস্থা। এগুলি শুধু দুর্বল দেশগুলিকেই ঋণ দেয় না শক্তিশালী দেশগুলিও ঋণের ব্যাপারে এদের ওপর একইভাবে নির্ভরশীল।

ঋণগ্রহণ আজকাল সবাই করে আপন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় ক্ষেত্রেতো বটেই, প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও তা করা হয়। তবে যেটা খেয়াল রাখার দরকার তা হল ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী যাতে না হয়ে যায়। কারণ ঋণ নিলে তার জন্য সুদ দিতে হয় যাকে আজকাল ডেট সার্ভিস বলা হয়ে থাকে। এবং সেটা যাতে বিপজ্জনক স্তরে না পৌঁছে যায় সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

বৈদেশিক ঋণের সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত তুলে ধরেছেন, অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে। এর ভাল-মন্দ দুটো দিকই তাঁর লেখাতে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন এই বইটিতে, সঙ্গে এর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত।

তিনি সমস্ত সমস্যাটিকে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে "বৈদেশিক ঋণগ্রহণ। ডলারের বিনিময়ে টাকার অবমূল্যায়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিকে আমন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দেশে কতটা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে তা নির্ভর করে দেশের ভিতর আর্থিক শৃংখলার (Fiscal Discipline) উপর।"

শ্রী মুরারি ঘোষ এবং শ্রী দেবব্রত পান্ডা সমস্যা বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধানের পন্থাও তাঁদের বইতেও আলোচনা করেছেন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে আমরা প্রচলিত অর্থে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে থাকি। ফলে তাতে একধরনের বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হল সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে এতদিন যা আমরা বুঝে এসেছিলাম সেটাকেই বজায় রাখা হবে — না বর্তমানে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ সব চাইতে শক্তিশালী দেশ চীনের "সমাজতান্ত্রিক বাজারী অর্থনীতি"তে আস্থা স্থাপন করব?

মুরারিবাবুর গ্রন্থের অধিকাংশই ইতিপূর্বে ছোট ছোট প্রবন্ধের আকারে গণশক্তি ও শারদীয়া সত্যযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তার বক্তব্য মোটামুটি পশ্চিমবাংলার মুখ্য শাসক দলের বক্তব্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দেবব্রতবাবুর লেখা আরও বামঘেঁষা বলা যায়। এরা দুজনেই শুধু বৈদেশিক ঋণের মধ্যেই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি আলোচনা করেছেন ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার — ফলে ব্যাঙ্কিং, ডাঙ্কেল প্রস্তাব সব কিছুই এর মধ্যে চলে এসেছে।

মুরারীবাবুর মতে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এদেশে ডাঃ মনমোহন সিং চালু করছেন তাতে কোন লাভ হবে না। দেশ চলে যাবে সাম্রাজ্যবাদের হাতে, এতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী পণ্যের দাম বাড়বে। ফলে আমদানী আরও কমবে, শিল্পোৎপাদন কমবে। উৎপাদন কমলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। টাকার দাম কমলে বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এরকম আশা না করাই ভাল। খাদ্যদ্রব্যের সংগ্রহমূল্য বাড়ানো উচিত নয় কারণ তার সুফল ছোট চাষীরা পায় না। বাদো ভরতুকি দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এমনি নানা কথা।

সরকারী সংস্থা লোকসান দিলেও এদের টিকিয়ে রাখার সমর্থনে তিনি বলেছেন লোকসান দিলেও এরা ঠিকমত ট্যাক্স দেয়, বেসরকারী সংস্থারা চুরি করে। কিন্তু লোকসান দিতে দিতে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যাবে তখন ট্যাক্স কোথা থেকে আসবে সে কথা তিনি বলেন নি। তাছাড়া এদের টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারী ভান্ডার থেকে যে ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে সেটাই বা কোথা থেকে আসবে?

আরেকটি কথা তিনি বলেছেন যার অর্থ বুঝতে পারা খুবই মুশকিল, যেমন " আদতে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্র বলে কিছু আছে কি? সকল বেসরকারী শিল্প বাণিজ্য সংস্থায় সরকারি পুঁজি রয়েছে। হয় ঋণের আকারে নয়তো শেয়ার পত্রে, কিংবা কর ছাড়ের সুযোগে। এসব ব্যবস্থা না থাকলে ভারতে বেসরকারী পুঁজি এক পাও হাঁটতে পারবে না," (পৃ ৬৪-৬৫) আবার এও বলেছেন "তাই প্রশ্ন, প্রাইভেট সেক্টর বলে আদতে এই দেশে কিছু আছে কি? তথাকথিত এই প্রাইভেট সেক্টর থেকে সবরকম সরকারী টাকা ও সম্পদ-সাহায্য গুটিয়ে নিলে বা বন্ধ রাখলে সরকারের ঘাটতি বাজেট উপচে পড়বে " (পৃ ৬৫)।

এখানে সত্যিই প্রশ্ন উঠবে বেসরকারী ক্ষেত্র বলে আদতে যখন কিছু নেই তখন এর জন্য তিনি এত কথা খরচ করলেন কেন? বেসরকারী সংস্থায় সরকারি সংস্থার পুঁজি খাটে এটা আমরা

জানি, যেমন ব্যাঙ্কের, ইউনিট ট্রাস্টের, জীবন বীমা সংস্থা ইত্যাদির কিন্তু এগুলি সরকারী অর্থভাণ্ডারের টাকা নয়। প্রধানত তা জনসাধারণের কাছ থেকে আসে আমানত আকারে একটি বিশেষ শর্তে এবং তা একদিন ফিরিয়েও দিতে হয় নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর। কাজেই এই টাকাটা সরকারের নয়, এই টাকা লগ্নী করে যেটুকু আয় হয় সেটুকুই সরকারের কাজে লাগে। মুরারীবাবুর প্রস্তাব মত যদি সরকার সব টাকা তুলে নিয়ে উপরে পড়া বাজেটের টাকা হিসাবে খরচ করেন তাহলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা কি হবে এবার ভাবুন।

দেবব্রতবাবুর বইতেও এমনি অনেক মজাদার কথা আছে। যেমন "ফান্ড ব্যাঙ্কনীতি কার্যকর করার অর্থ এদেশের শ্রমজীবিদের বঞ্চিত করে ধনীদেশের ভোগকারীদের স্বার্থরক্ষা। মুক্তো কাটার কথা ধরা যাক। ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাদের ব্যবহৃত ১০টি মুক্তোর মধ্যে সাতটি কাটা হয় ভারতে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শামুক কিনে এনে কাটিয়ে নেওয়া হয় কিছু দক্ষ কারিগর দিয়ে। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে এরকম দশলাখ কারিগর আছেন। তারপর সে মুক্তো রপ্তানি হয় পশ্চিমের দেশে দেশে।" দেবব্রতবাবুর লেখা থেকে আমরা এই প্রথম জানতে পারলাম শামুকের পেটে মুক্তো হয়, এতদিন জানতাম এক ধরনের সামুদ্রিক ঝিনুকের পেটে মুক্তো পাওয়া যায়। সে জিনিষ আমাদের উপকূলেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। কষ্ট করে বিদেশী মুদ্রা খরচ করে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঝিনুকের বদলে শামুক আমদানী করতে হবে কেন? তাছাড়া মুক্তো কালচার করা হয় এরকম একটা কথা আমরা শুনেছি তাকে কাটা হয় এমন কথা শুনিনি। যেটা কাটা হয় এ দেশে সেটা মুক্তো নয় তা হল হীরে এবং এই বস্তুটি দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এটাকেই এদেশে আমদানী করা হয়। এই হীরে কাটার ব্যাপারটা সবাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। এর প্রয়োজনীয় কুশলতা ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে খুব বেশি। ফলে বোম্বাই এবং সুরাট অঞ্চলে হাজার হাজার বাঙালি কারিগর এই শিল্পে নিয়োজিত। এবং এদের মজুরী কিন্তু নেহাত কম নয়। দেবব্রতবাবুর কথামত যদি দশলাখ শ্রমিক এতে নিয়োজিত থেকে দেশের কারিগরি কুশলতা কাজে লাগিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয় তাতে অপরাধ কোথায়?

তাদের সমস্ত কথার মধ্যে যেটা যুক্তিগ্রাহ্য সেটা হল এই ঋণের জট থেকে সাবধানে থাকা ভাল। মনে হয় ডাঃ মনমোহন সিং তাঁদের সাবধানবাণী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কারণ ভবিষ্যৎবাণীগুলো মোটামুটি ডাঃ সিং এখনও সফল হতে দেন নি। যেমন — টাকার অব মূল্যায়নের ফলে শিল্পে উৎপাদন কমে নি, বরং উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়েনি উল্টে কমে গিয়ে মোটামুটি ৬-৭% এর মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। বিদেশে রপ্তানী টাকার অবমূল্যায়নের ফলে কমে যাওয়ার পরিবর্তে বহুল পরিমাণে বেড়েছে শুধু তা-ই নয়, আমদানী কমে যাওয়ার ফলে বহু বছর বাদে ভারতবর্ষে ব্যালান্স অব ট্রেড দেশের পক্ষে রয়েছে।

বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এদেশে বিশাল ভাবে হওয়াতে ভয় মুরারিবাবুরা করেছিলেন তা সফল হয়নি। কারণ অবশ্য অনেক তার মধ্যে প্রধান হল সরকারী আইনের নাগপাশ এখনও যথেষ্ট শিথিল নয়, দ্বিতীয়টি হল আমরা যাকে ইনফ্রা-স্ট্রাকচার বলে থাকি তার অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষে আজও বিদ্যুতের অভাব, যা না হলে আজকের যুগে কোন শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। খনিজ তেলের অভাবের কথা না তোলাই ভাল। ফলে গত এক বছরে মোট বিদেশী পুঁজি লগ্নীর যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে (মোট ৭২৭১ কোটি টাকা) এর অর্ধেকই নিয়োজিত হবে বিদ্যুৎ এবং খনিজ তৈল শোধনাগার তৈরিতে। মেশিনারি তৈরির ক্ষেত্রে লগ্নী শতকরা মাত্র ১.১ ভাগ।

সবকথা বলার পরেও একটা কথা থেকেই যায় সেটা হল বিপদ এখনও কাটে নি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (সেপ্টেম্বর ১৯৯২) আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২০৩,০০০ কোটি টাকা, বর্তমান ডলার মূল্যে ৭১১১ কোটি ডলার। এর সঙ্গে যোগ হবে দেশরক্ষা খাতে যে অর্থ ঋণ নেওয়া হয়েছে বিদেশ থেকে সেই অঙ্ক, যে অঙ্কটা কখনই প্রকাশ করা হয় না। এছাড়াও আছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে রুবলের অঙ্কে যে ঋণ আছে সেটা অর্থাৎ অবস্থা অত্যন্ত জটিল।

এর ফল কি হচ্ছে? এ বৎসর যে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হল ৭২০ কোটি ডলার অর্থাৎ ২২,৪০০ কোটি টাকা। অর্থপ্তরের শেষ হিসাবে জানা যায় এই টাকার ৮৮% চলে যাবে সুদ এবং আসল হিসেবে ফেরত দিতে ফলে এই ২২৪০০ কোটির ভেতর যে টাকা দেশে আসবে তার পরিমাণ হল মাত্র ২৩৩৯ কোটি টাকা। অতএব পরিস্থিতি যে সঙ্কটজনক তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেরিয়ে আসবার রাস্তা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে, আর সে ব্যাপারে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। সেই অর্থে আমরা এই ধরনের আলোচনামূলক গ্রন্থের প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই। তবে এই আলোচনাতে দলীয় রাজনীতি যাতে কম থাকে সে দিকে নজর দেওয়া উচিত।

বৈদেশিক ঋণ — সুব্রত গুপ্ত/ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলি-১৩ / ২২ টাকা

আই এম এফ এর ঋণ ও ভারত — মুরারি ঘোষ/ রত্না প্রকাশন, ২/৭৩ বিবেকনগর, কলি-৭৫ / ২০ টাকা

ঋণের ইন্দ্রজাল: দেউলিয়া দিন — দেবব্রত পান্ডা/ কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ / ৩০ টাকা

একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা

কাজী সুফিউর রহমান

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পরাজয় সেদিনকার বাঙালি মুসলমানদের কাছে ছিল শাসকের পরিবর্তন মাত্র।(১) কিন্তু ১৭৬৪ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গেই শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সদা শাসিত শ্রেণীতে পরিণত মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক সাপে-নেউলে হয়ে দাঁড়ায়। কার্যত বিজেতারা বিজিতদের থেকে নিজেদের যত ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল বিজিতরা বিজেতাদের উপর ততোধিক ব্যবধান সৃষ্টি করে আত্মঘাতী পথ গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, নবাগত পশ্চিমী সংস্কৃতি, ধারণা ও দর্শনের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি, ধারণা ম্লান হয়ে যায়। হিন্দুরা তা সহজে গ্রহণ করলেও মুসলমানরা করেনি। কাজেই দুই সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা অগ্রগতির বিস্তর ফারাক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত স্বধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় দেশীয় মুসলমান সম্প্রদায় এতদিন 'Easy going lucky man' হিসেবেই দিন কাটাচ্ছিল।(২) এবার তা হইল না। তৃতীয়ত, এতদিন ফতোয়া জারী করার মালিক ছিলেন বাদশাহ বা নবাব নিজে; কিন্তু এখন এদের অনুপস্থিতিতে আলেম সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে ফতোয়া জারী করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনো প্রয়োজনে কখনো অপ্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরূপতা এবং উদাসীনতা সৃষ্টি করেছিল।(৩) এই সব নানা কারণে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প-কলা, বিচার-প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে থাকে এবং কোম্পানির শাসনের শেষের দিকে তলানিতে পৌঁছে যায়।

এই অবস্থায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় একদল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান ইংরেজ-বিরুদ্ধ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। এর আরও কিছু পরে ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন যুক্ত হলে বাংলার মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া যথার্থভাবে শুরু হয়। এই আন্দোলনের সময় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ব্যাপকভাবে দেখা যায় এবং একইসাথে কংগ্রেসের সাথে তাদের একটা আকস্মিক মৈত্রীবন্ধনের সুযোগ ঘটে যায়। এর আগে রাজনৈতিক আবেগের টানে এত সংখ্যক বেশি বাঙালি মুসলমান কখনো স্কুল, কলেজ, চাকরি, সংসার ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেয়নি। এদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে পেশাদারি রাজনীতিতে থেকে গিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক ভাবধারাকে পুষ্ট করেছেন। আবেগধর্মী খিলাফত আন্দোলনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে এই খিলাফত নেতারা অনেকেই কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হয়ে যান। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষে যান। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি স্বরাজ পার্টি, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি প্রভৃতি করে অবশেষে মুসলিম লিগের দলভারি করেন। জাতীয়তাবাদী অনেক নেতার ধারণা এইসব নেতাদের ধরে না রাখার জন্য সেদিনের কংগ্রেসের নীতিই দায়ী।(৪)

বৃটিশ শাসনাধীনে অনেক রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকের নাম পাওয়া যায় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বংশানুক্রমে দেশের হয়ে রাজনীতি করেছেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক বাহক হয়েছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সমাজে। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কাসিয়াড়া গ্রামের একটি পরিবার ১৮৫৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘকাল একটানা রাজনীতি করে চলেছেন। এখানে আলোচ্য সময়সীমা ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই পরিবারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রথমত, এদের রাজনীতি বংশানুক্রমিক ভাবে এবং আদর্শ ও চিন্তাভাবনা বিচিত্র ধারা-উপধারাতে সমৃদ্ধ, দ্বিতীয়ত এদের অনেকেই উত্তর ভারতে এবং মধ্য ভারতে কাটালেও রাজনীতি করেছেন বাংলাতে। ফলে উর্দু ফার্সিতে পণ্ডিত হয়েও বাংলার জন্য বাঙালির জন্য ওকালতি করেছেন। তৃতীয়ত — এরা সামাজিক বিন্যাসে জমিদার ছিলেন

না, ফলে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রসূত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে মূলত, কৃষক প্রজা-রায়তদের স্বার্থে। চতুর্থত — এরা অনেকেই শহরে রাজনীতি করলেও আবাসস্থল ছিল সুদূর নিজ পল্লীগ্রামে। ফলে কেউই তেমন শহরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেননি। সর্বশেষত, এদের বেশীর ভাগই ছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থের ধারক ও বাহক।

॥ ১ ॥

এই পরিবারের গোলাম আসগর বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন "সদরওয়ালী" (Subordinate judge) ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানির অধীনে চাকরি করলেও গোলাম আসগর দেশের আজাদির সপক্ষে ছিলেন। প্রামাণ্য তথ্য থেকে জানা যায় 'সিপাহী বিদ্রোহের' নেতৃস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার পত্রালাপ ও যোগাযোগ ছিল।(৫) কাজেই গোলাম আসগরকে কোম্পানির প্রশাসন বিভাগ সিপাহীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে চিহ্নিত করেন। এর উত্তরে সেদিন তিনি বলেছিলেন, "আমরা বিশ্বাসঘাতক না হলে তোমরা এ দেশে শাসন করতে কি করে?"(৬) তার উত্তরের তাৎপর্য বুঝতে দেরি হয়নি শাসককুলের। কাজেই তার বিরুদ্ধে আর বড় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি তারা। আসগর ইংরেজপন্থী না হলেও এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের সঙ্গে তাল না দিয়ে তিনি তার দুই পুত্র আব্দুল জব্বার ও আব্দুল মজিদকে ইংরেজি শিক্ষা দেন। কনিষ্ঠ মজিদ এন্ট্রান্স পাশ করেই কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারি বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন এবং অগ্রজ আব্দুল জব্বার প্রখ্যাত সাহিতিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন।(৭) কিন্তু আব্দুল জব্বার বি.এ. পাশ করার আগেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে লেখাপড়ায় ইতি টানেন, ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে প্রথম বাঙালি গ্র্যাজুয়েট হবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

॥ ২ ॥

এই পরিবারের চেতনার উন্মেষ করে থাকেন যদি গোলাম আসগর তাহলে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর জোষ্ঠপুত্র নবাব আবদুল জব্বার (১৮৩৭-১৯১৮)। তাঁর পিতাকে ব্রিটিশ বিরুদ্ধ চেতনার জন্য ধমক খেতে হয়েছিল, সম্ভবত একথা তাঁর বালকমনে দাগ কেটেছিল। তাই পরবর্তীকালে আমরা ইংরেজ শাসনের প্রতিভূ হিসাবেই তাঁকে দেখতে পাই— ভাগ্যে জুটেছিল খানবাহাদুর, সি.আই.ই. প্রভৃতি খেতাব। আদর্শগতভাবে তিনি ব্রিটিশপন্থী হলেও এ দেশের তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের ব্যাপারে প্রয়াসী ছিলেন। ১৮৮৯-১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। চাকরিতে নিষ্ঠা ও সরকারের প্রতি আনুগত্যের পুরষ্কার স্বরূপ তিনি ১৮৯৫ সালে খানবাহাদুর ও সি.আই.ই. উপাধি পান। ইতিপূর্বে তিনি ১৮৮৪,'৮৬ এবং '৯৩ সালে বাংলা ব্যবস্থাপকসভায় মোট তিনবার সদস্য মনোনীত হন। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ভূপালের নবাব শাহ্জাহান বেগমের প্রধানমন্ত্রীপদে (১৮৯৭-১৯০২) বহাল হন।।(৮) এই সময়ে তিনি বেগম কর্তৃক নবাব উপাধি লাভ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুসলমানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার অনেকগুলির সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৬ মে তারিখে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান Muhammedan Association প্রতিষ্ঠিত হলে আব্দুল জব্বার তার সদস্যপদ লাভ করেন।।(৯) নবাব আবদুল লতিফের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল; কাজেই Muslim Literary Society র সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০০ সালে তিনি ঐ সোসাইটির সভাপতি হন।(১০) গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে সেই আন্দোলনের সমর্থনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা হয়, নবাব আব্দুল জব্বার সেখানে সভাপতিত্ব করেন।(১১)

ইংরেজি শিক্ষার সুবিধার কথা নবাব আব্দুল জব্বার স্বীকার করলেও ধর্মীয় কারণে প্রথাগত ইসলামি শিক্ষা পাশাপাশি রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তদানীন্তন Muhammedan Endowment Committee-এর সেক্রেটারী P. Nelson কে ১৮৮৮ সালে এক চিঠিতে তিনি অনুরোধ করেন যে ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের গচ্ছিত টাকা ইংরেজি শিক্ষায় ব্যয় না করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন সমিতি গঠন করা না হয়।(১২) অনুরূপভাবে ১৯১৩ সালের Muhammedan Wakf Validating Act-এর বিরোধিতা করে বলেন যে কাজীর ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে হাদিস সংক্রান্ত সমস্যা আইনে পরিণত করা সমীচিন নয়।(১৩) এককথায়, নবাব জব্বার ছিলেন ইসলামিক প্রথা বা নিয়মকে আইনে পরিণত করতে অনিচ্ছুক।

মুসলমান সমাজের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে নবাব আব্দুল জব্বার ছিলেন উদগ্রীব। মুসলিম বালিকাদের ইসলামী লেখাপড়ার অনুপ্রেরণামূলক দুটি উর্দু পুস্তিকা এবং 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' নামে একটি বাংলা বই লেখেন। এই সব পুস্তক থেকে জানা যায় তিনি মহিলাদের সাধারণ শিক্ষায় অনুৎসাহী ছিলেন। তার মতে, মেয়েরা বাড়িতে নিবদ্ধ থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে, প্রয়োজন হলে স্বামীকে চিঠিপত্র দেবার মতো বাংলা শিখবে। কখনই ইংরেজি শিখবে না।(১৪) তার এই চিন্তাধারা তার পরবর্তী প্রজন্মেও সমান কার্যকরী ছিল। ফলত এই পরিবারে কোন শিক্ষিত মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য বৌবাজারে ১৮৯৬ সালে টেলর হোস্টেল স্থাপিত হয়। এই হোস্টেলটির অবস্থানগত পরিবেশ দূষিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনধিক এই দাবিতে ১৯০৮ সালে আব্দুল জব্বার নতুন হোস্টেল নির্মাণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।(১৫) ফলস্বরূপ পরের বছরই (১৯০৯ সালে) অর্ধেক সরকারি অনুদানে এবং অর্ধেক চাঁদার ভিত্তিতে বেকার হোস্টেল তালতলায় স্মিথ লেনে স্থাপিত হয়।(১৬)

তাঁর জীবিতকালেই জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) এবং মুসলিম লিগ (১৯০৬) স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু তিনি কোন দলেরই উমেদার হননি। প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন মূলত সমাজ-সচেতক। তার চেতনা ছিল প্রগতিমূলক তবে ধর্মীয় অনুশাসনে বাঁধা। ধর্মপ্রাণ এই সমাজসচেতকের গোটা বাঙালি সমাজে কেমন স্থান ছিল সে বিষয়ে জনৈক রামপ্রাণ গুপ্তের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক "বঙ্গদেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাহাদের অনেকেই হিন্দুসমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন বটেন, কিন্তু আব্দুল জব্বার সাহেবই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন।"(১৭)

॥ ৩ ॥

নবাব আব্দুল জব্বারের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা তার অনুজ আবুল মজিদের পুত্র আবুল কাশেম (১৮৭৪-১৯৩৬) জীবনের শুরুতেই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৭ খ্রিঃ বি.এ. পাশ করে সরকারি চাকরি গ্রহণ না করে সরাসরি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৪ সালে কংগ্রেস কনস্টিটিউসন কমিটির সদস্য এবং ১৯০৫ সালে কংগ্রেস স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হন। তিনি খুব অল্প মুসলিম রাজনীতিবিদদের মতই বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন এবং সারা বাংলায় স্বদেশীর সপক্ষে জনসমর্থন আদায়ে তৎপর হন। তিনি স্বদেশী মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগের পাল্টা সংগঠন হিসাবে, Bengal Muhammedan Association প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পাদক মনোনীত হন।(১৯) এককথায় স্বদেশী পূর্ববর্তীযুগে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। রাজনীতির আদর্শে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীকালে দেখি ১৯১৯ সালে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করলে সুরেন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুগামীর ন্যায় তিনিও তা সমর্থন করেননি। অবশ্য ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি সরাসরি বিরোধিতাও করেননি। তিনিই একমাত্র বাংলার মুসলিম কংগ্রেস রাজনীতিবিদ যিনি ১৯০৫-১৯১৬ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতেন।(২০)

আবুল কাশেম একাধিকবার বঙ্গীয় আইনসভা এবং একবার কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালের পর তার রাজনীতি ক্রমাগত দক্ষিণপন্থী রূপ নিলেও সাধারণভাবে শিক্ষা প্রসারের জন্য ও গ্রামবাসীর নানান দুঃখ দুর্দশা ও অসুবিধা দূর করার জন্য আইনসভার ভিতরে ও বাইরে বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উচ্চস্তরের রাজনীতির ধারক-বাহক হলেও ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ জনগণ ও পেশাদারদের জন্য আন্দোলন করেন। তার দাবি ছিল চৌকিদারদেরকে পুলিশের মতই সঠিক বেতনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নথীভূক্ত করা হোক — কেননা তাদের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব পুলিশ অপেক্ষা কম নয়।(২১) বলা বাহুল্য, আবুল কাশেমের এই দাবী ১৯৭৮ সালে বাস্তবায়িত হয়। সেই সময়ে মোকতারগণ সমাজ অধিকার বলে জেলা জজের আদালতে মোকদ্দমা পরিচালনা করার অধিকারী ছিলেন না, যদিও তাদের অনেকেরই যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি আইন পরিষদে সদস্য থাকাকালে এই বাধা অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা আইন আকারে গৃহীত হয়।(২২) অতঃপর মোকতারগণ সকল ফৌজদারী আদালতে উকীল হিসাবে মোকদ্দমা পরিচালনা করবার অধিকার লাভ করেন। ১৯৩৪ সালের ওয়াকফ আইনের ফলে সারা ভারতের মধ্যে ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়; এর মূল প্রস্তাবক ছিলেন আবুল

কাশেম।(২৩) ১৯১৩ সালের Wakf Validiting Act বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে ১৯১৩ সালের Wakf Validiting Act এর নিয়ম অনুসারে ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্ধারিত হত কোর্টের রায়ের মাধ্যমে ; এখন থেকে নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হল। ফলে ওয়াক্ফ-ই- আল-আওলাদ অর্থাৎ বংশানুক্রমিক পারিবারিক সম্পত্তি বিষয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেকটা লঘু হয়েছিল। এ ছাড়াও আবুল কাশেম কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং একবার কলকাতা পৌরসভারও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।(২৪)

১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে আবুল কাশেম তাতে যোগ দেন এবং ১৯২০ সালের মার্চে মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে বিলেতে যে খিলাফত প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তার মধ্যে আবুল কাশেম ছিলেন অন্যতম।(২৫)

আবুল কাশেম বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন। একারণেই তাকে বাংলা এবং ইংরেজ উভয় ধরনের কাগজের সম্পাদক হিসাবে দেখি। তবে বাংলার প্রতি টান ছিল প্রবলতর। সাহিত্যসেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করলে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনগামী দলের অন্যতম ছিলেন আবুল কাশেম।(২৬)

১৯০৬ সালে ব্যারিস্টার ও জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুর রসুলের সহযোগিতায় 'The Mussalman' নামক দ্বি-সাপ্তাহিক যে জাতীয়তাবাদী ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার প্রথম ছয় সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন আবুল কাশেম। তার অসুস্থতার দরুণ পরে ঐ কাগজের আমরণ সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মৌলভী মুজিবর রহমান। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'দৈনিক বেঙ্গলী' প্রকার সহ-সম্পাদক ছিলেন তিনি।(২৭) এছাড়া Progress, Muslim standard, মোসলেম, নবযুগ প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তারই ইচ্ছায় নবপর্যায়ের নবযুগ পত্রিকায় তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।(২৮)

বর্ধমানের জনজীবনে বিশেষ করে তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবুল কাশেমের প্রভাব ছিল অপরিসীম।(২৯) তার জীবিতকালে বর্ধমানের ২নং পারকাস রোডের বাড়ি রাঢ় অঞ্চলের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল রাজনীতিবিদদের এক মিলন ক্ষেত্র ছিল।(৩০) বর্ধমানের টাউন স্কুল (১৯১৫ সালে) তারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়।(৩১) এবং স্বতন্ত্র একটি মুসলিম হোস্টেল তিনি তৈরি করেন। পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত ছাত্র না পাওয়া যাওয়ায় সেটি অবলুপ্ত হয়।(৩২) বর্ধমান মহামেডান আসোসিয়েশন তিনিই তৈরি করেন, যেটি পরবর্তীকালে তার পুত্র আবুল হাশিমের দ্বারা বর্ধমান মুসলিম লীগে রূপান্তরিত হয়।(৩৩)

॥ ৪ ॥

আবুল কাশেমের অনুজ আবুল হায়াত (১৮৮৯-১৯৬৮) সমবায় বিভাগের ইনসপেকটরের চাকরি ছেড়ে ১৯২০ সালে গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হন ; কংগ্রেসকর্মী হিসাবে, খিলাফতের আন্দোলনে নয়। স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি ছিলেন মূলত কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৩৮ সালের জলপাইগুড়ির কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভায় আবুল হায়াত কংগ্রেসে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন।(৩৪)

দাদা আবুল কাশেম 'নো চেঞ্জার' দলভুক্ত হওয়ায়, তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সীমাবদ্ধতা এসেছিল। ঠিক সেই সময়ে 'প্রো-চেঞ্জার' হিসাবে আবুল হায়াত আত্মপ্রকাশ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর তার রাজনীতি বর্ধমান জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে তিনি তাঁর জোতজমা বিক্রি করে বর্ধমান শহরে খদ্দর এবং স্বদেশীজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য 'স্বদেশীভাণ্ডার' নামে একটি দোকান খোলেন।(৩৫) স্বদেশীর হিড়িক বন্ধ হয়ে গেলে ঐ দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২২ সালে তিনি যখন আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হলেন, তখন তিনি বর্ধমান সদর মহকুমার কংগ্রেসের সভাপতি। বিচারে তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। এর পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়।

কারামুক্তির পর অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সহযোগিতায় অবহেলিত হরিজন শ্রেণীর মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার তাগিদে বোলপুর শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে ভুবনডাঙায় তিনি গড়ে তুললেন একটি প্রতিষ্ঠান — নাম দিলেন 'শিক্ষাগার'। তিনি এখানে কুড়েঘরে সপরিবারে একান্ত আশ্রমিক জীবন কাটাতে থাকেন। তার মহৎ প্রচেষ্টার কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকে দেখতে আসেন এই মানবসেবক ও তার 'শিক্ষাগার'কে । ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতন আগমনকালে জহরলাল নেহেরু

পরিদর্শন করেছিলেন এই 'শিক্ষাগার'।(৩৬) এভাবে যখন তিনি দারিদ্র-কবলিত, অশিক্ষিত, বদভ্যাস জর্জরিত মানুষগুলোর চারিত্রিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সবিশেষ আগ্রহী তখন এভাবে একজন দেশকর্মীকে নির্জনে থাকতে দিলেন না নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৮ সালে তাকে টেনে নিয়ে এলেন কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জনসংযোগ বিভাগের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল তার উপর।(৩৭) এতে একদিকে যেমন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হল অপরদিকে তেমনি বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ হল তাঁর। ধীরেধীরে বাংলাদেশে সৎ কর্মীরূপে, একনিষ্ঠ দেশসেবকরূপে এবং অক্লান্ত কর্মী-নেতারূপে তিনি পরিচিত হলেন। এর স্বল্পকাল পরেই নেতাজি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। কিন্তু আবুল হায়াত কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন।

ইতিপূর্বে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দৃষ্টি পড়েছিল এই বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও দেশকর্মীর উপর। ১৯৪০ সালে তিনি আবুল হায়াতকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অফিসে। তখন কংগ্রেসের 'হেড কোয়ার্টার' ছিল এলাহাবাদের মতিলাল নেহেরুর 'স্বরাজভবনে'। সেখানে তাকে দেওয়া হল বৈদেশিক যোগাযোগ অফিসের দায়িত্ব। তার কাজ ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে আসা উর্দু-ফারসী চিঠিপত্র ও কাগজ ইংরেজিতে অনুবাদ করা, জবাব লেখা এবং উর্দু ভাষাতে কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি প্রভৃতি রচনা করা। তিনি এ কাজ কয়েকবছর ধরে দক্ষতার সাথে করেন।

দীর্ঘ সাতাশ বছর কংগ্রেসের সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে থাকার পর স্বাধীনতার পরেই তিনি কংগ্রেসের বলয় থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু কেন? তিনি ছিলেন বাংলাবিভাগের পুরোপুরি বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন বাংলা ভাগ করতে ব্যস্ত তখন তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যেখানে বিভক্ত বাংলাকে এক করতে মরীয়া ছিলেন সেখানে বর্তমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে বাংলাভাগের দাবি করার অধিকার কে দিল?(৩৮) দেশভাগের সময় সীমান্তগান্ধি আক্ষেপ করে বলেছিলেন "Thrown to the wolves", আর আবুল হায়াত বললেন, "The Congress instead of rescue of non-League Muslims left them in the lurch."(৩৯) বস্তুত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আদর্শগত সংঘাতের জন্য তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

জেলবাস এবং শান্তিনিকেতনের আদিবাসীদের প্রভাব তার পরবর্তীজীবনে খুবই কার্যকরী ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি হয় ১৯১৫-এ সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলায় এবং হায়াতের সম্পর্কিত ভাগ্নে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ জেলা পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে বর্ধমান জেলায় কৃষকদের স্বার্থে কিষাণসভা গড়ে ওঠে। সেদিন যেসব সোসালিস্ট কর্মীদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে ১৯৩৭-৩৯ সালের দিকে একযোগে কাজ করতে বাধা বা আপত্তি ছিল না, তাঁদের মধ্যে ঐ জেলার উল্লেখযোগ্যরা হলেন মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল, আবুল হায়াত এবং জাহেদ আলী মোল্লা প্রমুখেরা। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল পরবর্তীকালে একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট এবং সারা ভারত কিষাণ সভার সভাপতি হয়েছিলেন। আবুল হায়াত ১৯৯৯ সালে রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন এবং ১৯৪৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় যে নিখিল ভারত কিষাণসভা হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ (১৩-১৪ই) মাসে বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে প্রাদেশিক কৃষক সভা সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে গঠিত সভাপতি পরিষদের তিনজনের একজন ছিলেন আবুল হায়াত।(৪০) বহু বছর যাবত তিনি বর্ধমান কিষাণ সমিতির সভাপতিও ছিলেন। এইভাবে তিনি কমিউনিস্ট কর্মী, আদর্শ এবং কিষাণ সভার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যান। কংগ্রেসের তথাকথিত কৃষক আন্দোলন মুসলমানদের কিভাবে বিচ্ছিন্না করে লীগে যোগদান করতে বাধা করেছিল সে সম্পর্কে তার অভিমত "The kishan front of the Congress only helped subotage the kishan movement. The Congress issued instruction to its members not to join the non-Congress Kishan sabha on the plea that involved violence. In this manner the Congress leadership not only checkmated the revolutionary movement of the Kisans' for the time being, but did great harm to the unthinking muslim masses by alienating them from the Congress and an willingly .....forcing them to join Muslim League". কৃষক মজদুর আন্দোলনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শুধু তাই নয় শেষের দিকে তিনি কমিউনিজমের প্রতি ঝুঁকেছিলেন, তবে শারীরিক অক্ষমতার দরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে পারেন নি।(৪২)

শুধু রাজনীতিই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির সপ্রতিভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আবুল হায়াত। তিনি তিনের দশকে বর্ধমান থেকে "The light" এর অনুকরণে "আলোক" নামে একটি পত্রিকা বের করেন, তবে তা বেশিদিন চলেনি। মাঝে মাঝে তিনি মুজিবর রহমানের 'The Mussalman' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। আচার্য জে. বি. কৃপালনীর 'Vigil' পত্রিকায় "Muslim Politics" নামে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছুদিন লিখেছিলেন।[৪৩] শেষ বয়সে 'নেদায়ে ইসলাম' (ইংরেজি সংস্করণ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

উর্দু সাহিত্যে ও ভাষাদক্ষতায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকার সুবাদে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের একুশটি গল্প "EKKIS KAHANI" নামে উর্দুতে রূপান্তরিত করেন যা ১৯৬২ সালে দিল্লী সাহিত্য একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে Indian Express এর বুক রিভিউ স্মরণ করা যেতে পারে, "By avoiding the Delhi or Lucknow style of Urud Mr. Abul Hayat Burdwani has not only made his translation easily readable but has also been able to carry some of Tagore's skill as a recontenur into his own work."[৪৪] দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুর রসুলের জীবনী তিনি উর্দুতে করেন যা দিল্লীর উর্দু মাসিক 'আজকাল' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তার লিখিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক "The Mussalmans of Bengal" বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

স্বভাবতই মনে হয় তিনি রাজনীতি চর্চা না করে শুধু সাহিত্য চর্চা করলে তার সাহিত্যকীর্তি সমৃদ্ধশালী হত। তার অধিকাংশ রচনা হয় ইংরেজি অথবা উর্দুতে। তার প্রথমজীবন অতিবাহিত হয় উত্তর ভারতে। ফলে তিনি উর্দুভাষা আয়ত্ত করেছিলেন তাদের মতোই। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি, ফলে সে বিষয়েও তিনি জ্ঞানলাভ করেন। জেলে আটক হবার আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তাহলে কি হবে ? তিরিশের দশকে নিজে মাঝামাঝি সময় থেকেই মুসলমানদের ভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে এ বিষয়ে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। এ বিষয়ে The Mssalman পত্রিকায় একটি বিতর্ক হয়। সেখানে আবুল হায়াত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিপক্ষের যুক্তি নস্যাৎ করে বাংলা ভাষার পক্ষে মত দিয়েছিলেন — সেই বিতর্কটি অবশ্য তার উল্লিখিত বইতে সন্নিবেশিত আছে।[৪৬] তার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি দুর্বল হলেও নিজস্ব সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর টান ছিল পুরোদস্তর।

॥ ৫ ॥

মোহম্মদ আব্দুল মোমিন, খানবাহাদুর, সি.আই.ই (১৮৭২-১৯৪৬) ছিলেন নবাব আব্দুল জব্বারের মধ্যম পুত্র। ১৮৯৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পরে তিনিই হন বর্ধমানের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট।[৪৭] অন্যদিকে তিনিই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রথম মুসলমান বিভাগীয় (ডিভিশনাল) কমিশনার।[৪৮] ১৮৯৭ সালে তিনি সাব-ডেপুটি কালেকটররূপে কাজে যোগ দেন এবং ১৯০৬ সালে ডেপুটি কালেকটর হন। অবসর গ্রহণের আগে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার হন। সরকারি কার্যভার ত্যাগ করার পর তিনি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পদে ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় আসীন হন নি।[৪৯] ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় ওয়াকফ আইন ও সংবিধান রচয়িতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৩ সালে বঙ্গীয় ওয়াকফ বোর্ড (ভারতে সর্বপ্রথম) গঠিত হলে তিনিই হন এর সর্বপ্রথম ওয়াকফ কমিশনার।[৫০]

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর খানবাহাদুর আব্দুল মোমিন প্রথমে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ও তার আন্দোলন এবং পরে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৮ সালের ভারতীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রক্রিয়া স্বরূপ পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই আব্দুল মোমিন জড়িত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে এর সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান স্পেন্সার অ্যাসেম্বলির স্পিকার মনোনীত হলে ঐ পদের জন্য আব্দুল মোমিন ও ফজলুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৩৫ সালের ময়মনসিংহ কনফারেন্সে ফজলুল হক আব্দুল মোমিনকে হারিয়ে দেন।[৫১] ১৯৩৫ সাল থেকেই নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতির মধ্যেই মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টির অবস্থানগত পার্থক্য পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে। ঐ পূর্বোল্লিখিত দিনের ভোটাভুটিতে আকরম খাঁ আব্দুল মোমিন কে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আকরম খানের সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্ক কখনও ভাল হয়নি। গোপাল হালদার প্রসঙ্গত বলেন, "মোমিন সাহেব ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্মচারী এবং নোয়াখালিতে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর

বিশেষ কর্মদক্ষতা দেখেছিলাম — মুসলমানের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের কংগ্রেসি আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার কাজে, আর গরীব মুসলমানকে পরোক্ষে হিন্দু জমিদার মহাজন ধনী ব্যবসায়ীদের শোষণ সম্বন্ধে সচেতন করার কাজে।"[৫২]

ফজলুল হকের কাছে উক্ত নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি যখন পুরোপুরি ভাবে ফজলুল হকের মুঠোয় চলে যায় তখন আব্দুল মোমিন নব উদ্যমে লিগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদকের পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার মনস্থ করলে ঢাকার খাজাপন্থীরা বেগতিক বুঝে আবুল হাশিমকে ঠেকাতে উক্ত উক্ত দলের সভাপতি পদের জন্য মনোনয়ন করেন। কিন্তু আবুল মোমিন আকরম খান প্রভৃতিদের চালাকি বুঝতে পেরে উক্ত পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৫৩] আকরম খান, খাজাদের চালাকি ছিল একই পরিবারের দুজন লিগের সভাপতি ও সম্পাদক হচ্ছেন এই বয়সভিত্তিক অজুহাতে না-পসন্দ আবুল হাশিমকে ঠেকানো। ১৯৪১ সালে আবুল মোমিনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।[৫৪] লিগ রাজনীতিতে প্রথম দিকে আকরম খানদের আনুপন্থী হলেও পরের দিকে তিনি পুরোপুরি হাশিমপন্থী হয়ে যান।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টীকা ও সূত্র নির্দেশিকা

১. সাধারণত বলা হয়ে থাকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, নবাবের সেনাপতি, মহাজন এবং জমিদারদের চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। তবে একথাও ঠিক সেদিনের নবাবের পরাজয়ের পিছনে মুর্শিদাবাদবাসীর সক্রিয় মৌন সমর্থন ছিল। শহীদ নবাবের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশ নিয়ে শহর পরিক্রমা করেছিল মাত্র দু'শো গোরাবাহিনী। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গে বলেন নবাবের শবযাত্রা তথা তামাশা দেখতে মুর্শিদাবাদের যত প্রজা উপস্থিত হয়েছিল তারা যদি বন্দুক নয়, লাঠি নয়, অন্তত ঢিল ছুঁড়ত তাহলে গোরা সৈনাদের কবর হয়ে যেত। আসলে সেদিনের মুর্শিদাবাদের প্রজার কাছে নবাবের পরিবর্তন ছিল প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তনের মতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুর্শিদাবাদের প্রায় সব নবাবই Coup dc'tat এর মাধ্যমে সিংহাসনারোহণ করেছিলেন। এই ধারণার পরিবৃত্ত থেকে ১৭৫৭ সালেও তারা মুক্তি পায়নি।

২. খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'হকিকত-মুসলমান-ই বাংলা' থেকে জানা যায় মুঘল যুগে এবং নবাবী যুগে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের রায়ত স্বত্ব চালু ছিল। এই রায়তি স্বত্বের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি হল আল-তমঘা, আয়মা, মদদি ম' আকা, ফকিরান, ইনাম, মা' আফি, খানকাহ্ প্রভৃতি। এককথায় বলা যেতে পারে এত ধরনের রায়তি স্বত্ব চালু ছিল যে তার থেকে উচ্চবর্গীয় মুসলমানদের স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা চলত। এইসব রায়তি স্বত্ব মুসলমানদের কাছে বাড়তি পাওনা হিসাবে ছিল; কিন্তু নবাবির কাল শেষ হলে মুসলমানদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

৩. সুলতানী, মুঘল বা বিভিন্ন নবাবি যুগে ফতোয়া জারি করতেন সুলতান বা বাদশাহ স্বয়ং। পলাশীর পর বৃটিশরাজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হলে নবাবি নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুল্লাহ্ এবং আলেম সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এরাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফতোয়া জারি করতেন। এদের সবার মূল বক্তব্য ছিল ইংরাজ শাসনের প্রতি শুধু অসহযোগিতা নয়, এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হবে।

৪. মুসলিম লিগ ১৯০৬ সালে গঠিত হলেও ১৯৩৭ পর্যন্ত খাজা নবাবদের সংগঠনরূপে পরিগণিত হত। ১৯২০-২১ সালে খিলাফতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালি মুসলমান খিলাফৎ ও কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব মুসলিম জননেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস যথার্থভাবে সম্পর্ক রাখেনি বলে আবুল হায়াত, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাগণ তাঁদের লিখিত পুস্তকে দাবি করেন। তাঁদের বক্তব্য মুসলিম নেতারা বাধা হয়েই অবশেষে দীর্ঘ এক দশক পরে লিগে যোগদান করতে শুরু করেন এবং বাংলার রাজনীতির রূপরেখা পাল্টে ফেলার চেষ্টা করেন।

৫. বর্ধমান সম্মিলনী : সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা (১৩১৪-১৩৬৪) কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১১৭

৬. Abul Hashim, In Retrospection, Mowla Brothers, Dacca, 1974, P. 4.

৭. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), চরিতাবিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ, ৩০৪।

৮. সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান : সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃঃ ৪৭।
৯. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা (প্রথম খন্ড), ডঃ ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৩৮।
১০. ঐ, পৃঃ ১৪৯।
১১. বর্ধমান সম্মিলনী, পৃঃ ১১৭।
১২. Proceedings of Archives of West Bengal, General Education, File No 96, April , 1888, 1-3 (Appendix III).
১৩. Syed Abul Mansur Habibullah, The Law of Wakfs, Calcutta, First Print, 1976, P V (Introduction).
১৪. Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912) Oxford University Press, Dacca, First Published Nov. 1974, P. 344.
১৫. Kazi Sufior Rahman, Change and Continuity: A case study of certain aspects of the Muslim society of Burdwan District (1871-1947) (an unpublished M. Phil Thesis, Jadavpur University), P. 63.
১৬. Mojibar Rahaman, History of Madrasah Education, Calcutta, 1977, P. 151.
১৭. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮. (আশ্বিন) ১৩১০ বঙ্গাব্দে নবনূরে প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশ।
১৮. শামসুজ্জামান খাঁন ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), চরিতাবিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ২৬।
১৯. ঐ
২০. Sufia Ahmed, Op. cit, P. P. 378-393.
২১. লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার : সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্ (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মনসুর হবিবুল্লাহ্ আবুল কাশেমের দৌহিত্র)।
২২. এম. আব্দুর রহমান, স্বাধীনতা সংগ্রামী সপ্ত সাংবাদিক (প্রবন্ধ জননায়ক মৌলবী আবুল কাশেম) বুলবুল প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ৪৯।
২৩. লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার : সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্।
২৪. শ্রী বলাই দেবশর্ম্মা, স্বাধীনতা সাধনায় বর্ধমান, পৃঃ ১১৯।
২৫. এম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬
২৬. ঐ, পৃঃ ৫১।
২৭. ঐ, পৃঃ ৪৩।
২৮. ঐ, পৃঃ ৫১।
২৯. বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ছিল বাঙালি মুসলমানদের সামগ্রিকতার উন্মেষকাল। আবুল কাশেম সেই অর্থে সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু সেদিনের দেশবাসী তাঁকে নিয়ে বিন্দুতে হয়ত সিন্ধু মেলাতে চেয়েছিলেন। তার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ছড়াটি তা-ই প্রমাণ করে — কাসু মিয়া (কাশেম) বাপের বেটা/ লাট সাহেবের মহুরী দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই/ কেশেরা (কাশিয়াড়া) বাড়ী।.....
৩০. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃঃ ২।
৩১. জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, আমার কালের শিক্ষা, বর্ধমান সি. এম. এস. স্কুল, সার্ধশতবর্ষ স্মরণিকা (১৮৩৪ - ১৯৮৪), বর্ধমান, ১৯৮৪, পৃঃ ২৭।
৩২. লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার : সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ (ইনিও আবুল কাশেমের দৌহিত্র)।
৩৩. মফিদুল হক, আবুল হাশিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃঃ ২৫।
— লেখকের কাছে ১৯২৭ সালের All Bengal Muslim Conference এর একটি প্রচার পত্র সংগৃহীত আছে। এই সংগঠনের এটিই প্রথম সম্মেলন। আয়োজন হয় বর্ধমানে ১০-১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ খ্রিঃ। প্রধান প্রধান বক্তারা ছিলেন, সার পি. সি. রায়, আকরম খাঁন, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সার আবদুর রহিম প্রভৃতিরা।
৩৪. Abul Hayat, Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1966, P. 32.
এম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ দেশপ্রেমিক মৌলবী আব্দুল হায়াত) পৃঃ ৯৭।
৩৫. লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার : সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্।
৩৬. এম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।
৩৭. ঐ।
৩৮. দৈনিক স্বাধীনতা, ৬ ই মে, ১৯৪৭।
৩৯. Abul Hayat, Op. Cit. P.62.
৪০. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল, কৃষকসভার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮০, পৃঃ ১৩৪।
৪১. Abul Hayat, Op. cit. P.72.
আবুল হায়াত, আবুল মনসুর আহমদ, প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধারণা কংগ্রেসের ব্যবধানিক রাজনীতির ফলে খিলাফৎ ও মুসলিম কংগ্রেস কর্মীরা এক দশক অপেক্ষা করে অবশেষে লিগে যোগদান করে লিগের শক্তিবৃদ্ধি করেন। লিগ ১৯০৬ এ তৈরি হলেও ১৯৩৫-এর আগে কোন সংগঠন গড়তে পারেনি এবং লিগের শ্রীবৃদ্ধির পরোক্ষ কারণ কংগ্রেস নীতি।
৪২. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

৪৩. শ্রী ললিত হাজরা, আবুল হায়াত স্মৃতিকথা/প্রবন্ধ, ১৭-৪-১৯৬৮।
৪৪. এম. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৪৫. ঐ পৃঃ ১০২।
৪৬. Abul Hashim, Op. Cit. PP. 86 - 90.
৪৭. University of Calcutta, The Calendar, 1956, Part I, Univesity of Calcutta, 1958, P. year 1896.
৪৮. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৭০।
৪৯. ঐ।
৫০. Syed Mansur Habibullah, Op. Cit. P. VII (Introduction).
৫১. Kamruddin Ahmed, A Socio-political History of Bengal, Fourth Edition, 1975, P - 30.
৫২. গোপাল হালদার, রূপনারায়ণের কূলে, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬১।
৫৩. Abul Hashim, Op. Cit. P. 34.
৫৪. সাপ্তাহিক বর্ধমানবাণী, (২৭ সংখ্যা) ২০-১১-১৯৩১.
আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আজিজুল হক, তমিজউদ্দিন আহমদ, খান বাহাদুর আলফাজুদ্দিন আহমদ ও মৌলবী আবুল কাশেম (বর্ধমান)।

সভ্যতার কলঙ্ক — বসনিয়ার গৃহযুদ্ধ

পুলক নারায়ণ ধর

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। একদিকে সুপার-পাওয়ার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের মাঝারি ও ছোট মাপের দেশগুলি, যারা সোভিয়েতের ক্ষমতার ছত্রছায়ায় নিরাপদ বোধ করছিল তারা একটু একটু করে পাশ ফিরতে শুরু করেছে নতুন শক্তি-বিন্যাসের হিসাব কষে। এই পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী ফল আরও কিছু দিন পর পরিষ্কার বোঝা যাবে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ও ভয়াবহ ফল ফলতে শুরু করেছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্শ্ববর্ত পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

এইসব দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্র এতদিন বাইরের জগতের মানুষের কাছে তেমন পরিচিত ছিল না। আজ তা তীব্র আলোকচ্ছটায় নগ্নভাবে উদ্মোচিত হয়েছে। যেন প্যান্ডোরার বাক্সের ঢাকনা খুলে দেওয়ার পর তার ভেতর থেকে ক্লেদগ্লানি পোকামাকড়ের মতন ডানা মেলে বেরিয়ে এসেছে। বহুদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ ও যন্ত্রণার বহি:প্রকাশ ঘটাতে এরা পাগলের মতন আচরণ করছে।

এই রকম একটি দেশ হল যুগোস্লাভিয়া। যুগোস্লাভিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে স্তালিন শাসিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে বিশ্বের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু টিটোর সময় থেকেই যুগোস্লাভিয়ার আভ্যন্তরিক নানা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তার মৃত্যুর পর এই সমস্যা গভীর সংকটে রূপান্তরিত হয়।

এই সংকটের একটি পরিচয় হল বসনিয়া-হারজেগোভিনার বর্তমান গৃহযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বসনিয়া-হারজেগোভিনা যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্যবাদী দুনিয়ায় বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগোস্লাভিয়াও ভেঙ্গে যায়। এর ফলে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এরা হল স্লোভিনা, ক্রোশিয়া, সার্বিয়া এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনা। যুগোস্লাভিয়ার বর্তমান অবস্থাটা বোঝার জন্য আমাদের তার পূর্ব-ইতিহাসটা একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ তার পূর্ব ইতিহাস ও রাষ্ট্র গঠনের মধ্যেই বর্তমান সংকটের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

১৯১৮ সালে হ্যাপসবর্গীয় সম্রাট চার্লস এর ক্ষমতাচ্যুতির পর অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সার্ব, ক্রোট ও স্লোভিনাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রের নামকরণ হয় যুগোস্লাভিয়া (১৯২৯)। বিভিন্ন জাতি ও দেশ নিয়ে যুগোস্লাভিয়া তৈরি হয়েছিল একটি কৃত্রিম যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র হিসাবে। ১৯৮১ সালের একটি হিসাবে যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতির একটি বিন্যাস আমরা পাচ্ছি।

		শতকরা
সার্ব	—	৩৬.৩
ক্রোট	—	১৯.৮
মুসলিম	—	৮.৯
স্লোভেনিয়ান	—	৭.৮
আলবানিয়ান	—	৭.৭
ম্যাসিডোনিয়ান	—	৬.০
মন্টিনিগ্রো	—	২.৬
হাঙ্গেরীয়	—	১.৯
তুর্কি	—	০.৪
অন্যান্য	—	২.১
অজ্ঞাত	—	০.৭
অঘোষিত	—	৫.৭
		১০০.০

যুগোস্লাভিয়ার যে অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা চলছে সেই হারজেগোভিনার অধিবাসীরা বেশির ভাগই মুসলমান। অন্য রিপাবলিকগুলিতে খ্রিস্টান অধিবাসীরাই প্রধান। বসনিয়ার মুসলমানরা 'সুন্নী' সম্প্রদায় ভুক্ত। সার্বরা অবশ্য সকলকেই তুর্কি

বলে গণ্য করে। বসনিয়ার অধিবাসীরা কিন্তু সার্ব ও ক্রোশিয়ান ভাষায় কথা বলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সার্ব ও ক্রোটদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এর নাম 'চেতনিক' (CHETNIK)। এই 'চেতনিক' গোষ্ঠী মুসলমানদের জাতীয়তাবিরোধী বলে মনে করত। তারা তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে। বহু মুসলমান তার ফলে দেশ ছেড়ে চলে যান। মিশর, লেবানন, জর্ডন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে ওঁরা আশ্রয় নেন। ওঁদের বিরুদ্ধে 'প্যান ইস্‌লাম' আন্দোলন সংগঠিত করার অভিযোগ ওঠে।

সার্বদের সঙ্গে মুসলিমদের সঙ্গে বহু যুগের খারাপ সম্পর্ক। চতুর্দশ শতাব্দীতে উসমানীয় মুসলমানরা সার্বদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই সার্ব ও মুসলিমরা পরস্পরের বৈরী। প্রায় ছয়শত বছর মুসলমান শাসনে থাকা সত্ত্বেও সার্বরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্ব জাতীয়তাবোধের স্বতন্ত্র ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। অতীতের কোন কিছুই তারা ভোলেনি বা ভুলতে চায়নি। বংশপরম্পরায় তারা তা লালন করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়া গঠিত হলেও পুরানো ঝগড়া বা জাত্যাভিমান সার্বরা পরিত্যাগ করেনি।

পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ায় মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ এবং ৩০ ভাগ হচ্ছে যথাক্রমে 'চেক্' ও 'স্লোভাকরা'। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন রুশ জাতির জাতীয় আধিপত্য ছিল তেমনি যুগোস্লাভিয়াতেও সার্বদের আধিপত্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার সৈন্য বাহিনীর শতকরা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ অংশই সার্বদের দ্বারা গঠিত।

১৯৮৭ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আমরা বসনিয়া-হারজেগোভিনা এবং সার্বিয়ার জনবিন্যাসের একটি পরিচয় পাই।

বসনিয়া-হারজেগোভিনার ভৌগোলিক সীমানা ৫১,১২৯ (কিলো মিঃ হিসাবে) এবং জনসংখ্যা ৪,৩১৪ (১০০০ হিসাবে)। সার্বিয়ায়, ভেজোভিনায়, কসভোয় জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫,৭৮৭, ২,০৮৪ এবং ১,৭৬২ (১০০০ হিসাবে)।

জাতি বিদ্বেষ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব সামাল দিতে মার্শাল টিটোকেও বেগ পেতে হয়েছে। ১৯৭৪ সালে যুগোস্লাভিয়ায় নতুন সংবিধান রচিত হ'ল। সেই সংবিধানের মধ্যেই বহু বিচিত্রমুখী জাতি ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল। হাঙ্গেরীয় ও আলবেনীয়দের বাদ দিয়ে স্লোভাক, ক্রোট, সার্ব, মন্টিনিগ্রো, ম্যাসিডোনীয় এবং মুসলমানদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ১৯৭৪ এর সংবিধান-স্বীকৃত হ'ল। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার ধর্মীয় ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক জাতি হিসাবেই যুগোস্লাভিয়ায় স্বীকার করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে সার্ব নেতা স্লোবডান মিলোসেভিক (Slobodan Milosevik) এর নেতৃত্বে ভোজোডিনা (Vojvodina) ও কসভো (Kosovo) প্রদেশের আলবেনীয় এবং হাঙ্গেরীয়দের ক্ষমতা খর্ব করা হ'ল। বিভিন্ন জাতি ও রিপাবলিকগুলির মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। এ অবস্থা চলছিল কমিউনিস্ট পার্টির শাসন কালেই। জাতিসমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে কমিউনিস্টরা যতই গর্বভরে প্রচার করে থাকুন না কেন বরং দেখা যচ্ছে যে জাতিসমস্যা নানা কারণে সোভিয়েতের মতন যুগোস্লাভিয়াতেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট শাসনকালে অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরী মনোভাবের জন্ম হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির তর্জনী শাসন অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

১৯৭৪ সালে রচিত সংবিধান অনুসারে যুগোস্লাভিয়া একটি ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে কোনরকমে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভাঙ্গনের লক্ষণগুলি দুর্নিরীক্ষ্য ছিল না। যে কোন দেশেই রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক বাজারকে কেন্দ্র করে। সমগ্র যুগোস্লাভিয়াকে একটি সুসংবদ্ধ বাজারে পরিণত করার শক্তিগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। পরিবর্তে প্রত্যেকটি রিপাবলিকের সীমান্ত অঞ্চলে সব রিপাবলিক বা মিউনিসিপ্যাল বাজার গড়ে উঠতে থাকে। রিপাবলিকগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ ও আচরণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিপন্থী। প্রত্যেকটি রিপাবলিকের বিদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারিগরি, মূলধন বিনিময় ও ব্যবসা বাণিজ্য যত সহজ ও বেশি ছিল রিপাবলিকগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসাবাণিজ্য সে রকম ছিল না। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বিনিময়ের হারের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে এই হার ছিল ক্রমশ নিম্নমুখী।

১৯৭০	—	২৭.৭%
১৯৭৪	—	২৩.০ %
১৯৮০	—	২১.৭%

এই হারের কোন উন্নতি ঘটেনি। এ থেকে যুগোস্লোভিয়ার রিপাবলিকগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র পাওয়া যায়।

১৯৭৪ সালের পর রিপাবলিকগুলি স্বাধীন আচরণ শুরু করে। ফলে তারা সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার বাজার গঠনের স্বার্থ নিয়ে আগ্রহী না হয়ে স্বাধীন বহির্বাণিজ্যের প্রতিই বেশী উৎসাহী ছিল। ১৯৭৪ এর সংবিধানও এই খণ্ডীকরণের ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। রিপাবলিকগুলি ও প্রদেশগুলির শাসকরা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অভিন্ন (common) স্বার্থ বিষয়ক ক্ষেত্রেও তারা সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে।

এইভাবে প্রতিটি রিপাবলিকে ও প্রদেশে আমলাবর্গ ও কারিগরি ব্যক্তিরা নতুন রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস রচনা করে। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বুদ্ধিজীবিরা নতুন নতুন জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টিতেও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বাঁধন অনেক আলগা হয়ে আসতে থাকে। রিপাবলিক স্তরে পার্টিগুলো অনেকটাই স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্যস্তরে নেতৃত্বের মধ্যে কর্মকাণ্ডের সাযুজ্য রক্ষা করাই ছিল কঠিন। ফলে বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠল যুগোস্লাভিয়ায়। এরা নিজ নিজ এলাকার জন্য যতটা ভাবিত ছিল সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার জন্য ততটা নয়। এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ক্রমশ বলসঞ্চয় করে।

আরও একটি বিষয় যুগোস্লাভিয়ার রিপাবলিকগুলির আভ্যন্তরিক বিভেদ বাড়িয়ে তুলেছিল। যুগোস্লাভিয়ায় রিপাবলিকগুলি উন্নত ও অল্পোন্নত (Less Developed) — এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মন্টিনিগ্রো, ম্যাসিডনিয়া, বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা এবং স্বশাসিত কসোভ প্রদেশ ছিল অল্পোন্নত অঞ্চল। এই সকল রিপাবলিকগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রদেশ স্লোভানিয়া, ক্রোশিয়া এবং সার্বিয়ার কিছু অংশ — এদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার 'অধিকারী' ছিল। কিন্তু আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ নিয়ে দাতা এবং গ্রহীতা কেউই সন্তুষ্ট ছিল না। তাছাড়া অল্পোন্নত দেশগুলি তাদের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিতে সেই অর্থ কাজে না লাগিয়ে বেশির ভাগই ব্যয় করত পাঠাগার, স্টেডিয়াম ইত্যাদি পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডের জন্য। এই সব অর্থের হিসাবনিকাশও তারা দিতো না। উন্নত দেশগুলিও তাদের অর্জিত সম্পদ অন্য প্রদেশে খরচ হোক তা চাইত না। অর্থাৎ কমিউনিস্ট বা সর্বহারা ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রেরণা কোথাও ছিল না। সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চাপে বাধ্য হয়ে তারা ঐ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। এর ফলে সেই সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে নানা অশান্তি ও বিক্ষোভ জমে ছিল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার (IBDR) কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণের প্রায় ৮০ শতাংশ এই সকল অনুন্নত রিপাবলিক ও কসোভ প্রদেশের জন্যই ব্যয় করা হ'ত। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই ঋণ ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু তার দায় অন্য রিপাবলিকগুলিকেও বহন করতে হ'ত। অল্পোন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতি যে কিছুই হয় নি তা আগেই বলেছি। বরং অসম আর্থিক অবস্থার কারণে আটের দশক থেকেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। উন্নত রিপাবলিকগুলি ক্রমশ Fund for Assistance-এ তাদের দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করতে লাগল। এই ভাবে কালক্রমে Fund ব্যবস্থার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। আঞ্চলিকতাবাদের ও জাতি স্বাতন্ত্র্যের অহংকার যুগোস্লাভিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভাঙ্গনের পেছনে এই ভাবে ক্রমাগত মদত যুগিয়েছে। আদর্শ, মূল্যবোধ বা নীতি ও পরার্থপরতা কোন কিছু দ্বারাই সর্বজনীন মানুষ তৈরি করতে যুগোস্লাভিয়ার সরকার বা পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল। জাতিবিদ্বেষ ও পারস্পরিক হানাহানিতে ভীত ক্লান্ত এক ক্রোশীয় কবি Krleza এক সময় প্রার্থনা করেছিলেন : —

> "God Save us from Croation culture
> and Serbian heroism".

১৯৯১ সালের ২৫ জানুয়ারী ক্রোশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্লোভিনা সরকারও ঐ একই তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ম্যাসিডনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে নভেম্বর ১৯৯১-তে। কিন্তু বসনিয়া-হারজেগোভিনার স্বাধীনতা সার্বরা মেনে নিতে পারে না। ১লা মার্চ (১৯৯২) গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পক্ষে ৬৩% ভোট পড়ে। সার্বরা ভোট বয়কট করে। বসনিয়া মুসলিম প্রধান দেশ। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজেও বেগভিক।

১৯৭৩ সালে মুসলিমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা সার্বদের সর্বপ্রকার বাধা উপেক্ষা করে একটি ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট সরকার অবশ্য মুসলমানদের ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮১ সালে স্বায়ত্তশাসিত কসোভকে মুসলিমরা স্বাধীন রিপাবলিকের মর্যাদা দেবার দাবি তুললে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। বেলগ্রেডের বহু মসজিদও ধ্বংস করার অভিযোগ ওঠে। ১৯৮৫ তে বহু

মুসলমানকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৮৯ সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিক বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তার পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার প্রায় সমস্ত সৈন্যবাহিনী যার অধিকাংশই সার্ব জাতিভূক্ত।

যুগোস্লাভিয়ার জাতিদাঙ্গার ব্যাপার আন্তর্জাতিক সংস্থারাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত গড়ায়। সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখ (১৯৯১) নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে এই জাতিদাঙ্গা ও ধর্মযুদ্ধ (?) থামাবার জন্য সমস্ত বিবাদমান দলের ও গোষ্ঠীর কাছে আবেদন করে। রাষ্ট্রসংঘের তদানিন্তন সাধারণ সম্পাদক পিয়র দ্যা কুয়েলার-এর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে শান্তিস্থাপনের কাজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত হন সাইরাস্ ভান্স্ (Cyrus Vance)। ১৯৯২ এর অগস্ট মাসে (২৬-২৮) লন্ডনে যুগোস্লাভিয়ায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বুট্রোস্ ঘালি — রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান সম্পাদক, যুগোস্লাভিয়ার চারটি রিপাবলিক, ইউরোপীয় কমিউনিটির বারোটি রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য, কানাডা, জাপান, সৌদি আরব, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও ইসলামিক রাষ্ট্রের সম্মেলন (Conference of Islamic States) লন্ডন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে।

এর পূর্বে অবশ্য জেনিভাতে একটি বৈঠক আহ্বান করে (২৩ নভেম্বর ১৯৯১) সাইরাস ভান্স্ ক্রোট, সার্ব ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করে যুদ্ধবিরতির (cease fire) চুক্তিতে রাজী করান। শান্তিস্থাপনের জন্য এরপর (১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯১) স্থির হয় নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক বাহিনী প্রেরণ করবে। এই প্রস্তাব (৭২৪ নং) অনুসারে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯১ রাষ্ট্রসংঘবাহিনী জাতিদাঙ্গা বিধ্বস্ত যুগোস্লাভিয়ার মাটিতে পা দিল। কিন্তু শান্তি দূর অস্ত। বরং অভিযোগ উঠল রাষ্ট্রসংঘের নানাজাতির ও ধর্মের সৈন্যরাও সাম্প্রদায়িকতার আঁচে চামড়া সেঁকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে হত্যালীলায় জড়িয়ে পড়ছে। সাইরাস্ ভান্স্ এর প্রস্তাব বসনিয়ার মুসলমানরা মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। বসনিয়াকে দশটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার প্রস্তাব বসনিয়ার সরকার মেনে নিলেও সার্বরা এই প্রস্তাবও মেনে নেয় নি। ফলে অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়েছে। আলাপ আলোচনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। আন্তর্জাতিক মহলে নানা চেষ্টা চলছে শান্তিস্থাপনের, শুধু সার্ব ও মুসলমানরা নয়, সার্বদের সঙ্গে ক্রোশীয় জাতির মানুষদেরও বিরোধ চলছে। এবং অতিসম্প্রতি ক্রোশীয় প্রেসিডেন্ট ফ্রানজো টুডজম্যান (Franjo Tudjman) এক ভাষণে বলেছেন যে তার দেশ বাধ্য হবে "to take steps to secure that vital facility "(Mastenica bridge)" সার্বদের সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত করাই হচ্ছে ক্রোটেদের লক্ষ্য।

এইভাবে পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে আজ এক ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুই ভিন্নধর্ম ও একই ধর্মের বিভিন্ন জাতিগুলি আজ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসবঃ।

এ প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা চোখে পড়ল।★ বসনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সমস্যারও ওপর আলোচনা করে নুরুল আমিন মোল্যা একটি ছোট পুস্তিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রাপ্তিস্থান কলকাতার ইস্‌লামিক বুক সেন্টার। এই পুস্তিকাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যুগোস্লাভিয়ার সমস্ত ব্যাপারটিই হচ্ছে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় যুদ্ধ। বসনিয়ার বর্তমান দশার শুরু, আমিন মোল্যার মতে "সেই হাজার বৎসর আগে থেকেই, যখন এই অঞ্চলে মুসলমানদের প্রথম আবির্ভাব হয়। কারণ ইউরোপে তারা চায় এক বিশুদ্ধ খ্রিস্টান সাম্রাজ্য। ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের যেখানে কোন স্থান নেই"। (পৃ: ১৯)

শুধু তাই নয় নতুন করে 'ক্রুসেডের' স্মৃতিচারণ করে তিনি মুসলমানদের দু:খের কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। যুদ্ধ, দাঙ্গা বা সংগ্রামের কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বোধ করি করার ক্ষমতাও নেই। একটি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বোঝাবার জন্য তিনি আরেকটি সাম্প্রদায়িক বা মৌলবদী প্ল্যাটফর্ম বেছে নিয়েছেন। ইসলাম যেখানেই গেছে যেখানেই শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গেছে এবং অবিরাম মানুষ "স্বত:স্ফূর্তভাবে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট হবে ইহাই স্বাভাবিক" (পৃ: ১৩)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বীভৎস হত্যাকাণ্ডের যে সব বিবরণ বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে দাঙ্গাকে চিরস্থায়ী করতে তা যথেষ্ট বলেই মনে হয়। এই বীভৎসতার দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন খ্রিস্টানরা কত নিষ্ঠুর ও অমানবিক।

এক কথায় পুস্তিকাটি অত্যন্ত একপেশে ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। হত্যা ও পাশবিকতার চেহারা সবদেশেই ও সবকালেই একই রকম। বসনিয়াতে, সোমালিয়ায়, এমন কি পাকসেনাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরও (১৯৭১)। এর বীভৎসতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। শিক্ষা,

সংস্কৃতি ও মানসিকতার প্রশ্নই বড়। ধর্মান্ধতা বা মতান্ধতার কুলকুণ্ডলিনীর পাকে যখন মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান বা কি হিন্দু কারও কোন পার্থক্য থাকে না। ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার (বা রাজনৈতিক ও হতে পারে) ঐকা দৃঢ়ভাবে ও একই বিন্যাসে এদের শরীরে গ্রন্থিত।

সামাজিক ও অর্থনীতিক সমস্যায় যুগোস্লাভিয়ায় ধর্ম ও জাতিসত্তাবোধ সেখানকার মানুষদের বিচ্ছিন্নতাকে উস্কানি দিয়েছে মাত্র। আর্থ — সামাজিক সমস্যা ও মূল্যবোধহীন রাজনীতিই এর জন্য প্রধানত দায়ী। খ্রিস্টানদের আগ্রাসী নীতি ও মুসলমানদের শান্তিপ্রিয়তা এ সব কষ্টকল্পিত তত্ত্ব দিয়ে বর্তমান সমস্যার সামান্যও বোঝা যাবে না।

পরিশেষে ক্লেদক্লিষ্ট এই পরিবেশে শান্তিপ্রিয় মানুষরা শুধু বলতে পারে 'সীদন্তি মম গাত্রাণি, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।" আর সেই বৃদ্ধ দার্শনিক এর কথা মনে আসে যিনি মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভাবিত হয়ে বলেছিলেন বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করতে হবে। "All this can happen if we will let it happen. It rests with our generation to decide between this vision and an end decreed by folly". (Bertrand Russell, Has Man a Future?)

★রসনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মুসলমান-আবুরিদা মোহাম্মদ নুরুল আমিন মোল্যা। কলকাতা - ১৪/১৮ টাকা।

কি ধরনের কসমোপলিট্যান সমাজ আমাদের কাম্য ?

মাননীয় সম্পাদক, আপনার পত্রিকায় ('চতুরঙ্গ', বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১ মার্চ, ১৯৯৩) সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ'-এর 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার' শীর্ষক সন্দর্ভটি পড়লাম। লেখক সন্দর্ভটির মধ্যে দুর্দান্ত একটি প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয়তাবাদ নিয়ে। জাতীয়তাবাদের ধুয়ো সংঘ পরিবারও তুলেছে। সুতরাং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম চালানো যাবে কিনা? গৌরকিশোর লিখেছেন, 'না, আমরা জাতীয়তাবাদ চাই না। আমরা ভারতে এক ছাঁচে গড়া সমাজ চাই না। আমরা চাই কসমোপলিট্যান সমাজ।' কেন? 'রাষ্ট্রীয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে আছে এক বিমূর্ত ধারণা — যা নানারূপে যথা কখনও দেশ কখনও জাতি, কখনও বা বিশেষ মতাদর্শ এসবের ভেক ধরে আমাদের সামনে আসে। মানুষকে আচ্ছন্ন রাখে। কসমোপলিট্যান চেতনা এরই একেবারে বিপরীত মেরুতে। মানুষ, রক্তমাংসের মানুষই সেই চেতনার মূলবিন্দু। কসমোপলিট্যান সমাজ ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতিকে কোনও কেন্দ্রীয় জাঁতাকলে পেষাই হতে দেয় না। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সে সমাজ যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করে তাকেই আমরা মানুষের উত্তরাধিকার বলি'।

অত্যন্ত চিন্তাযোগ্য প্রস্তাব। প্রসঙ্গত এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে কিছু সংযোজন আনা যায় এবং তোলা যায় পাল্টা কিছু প্রশ্ন। প্রথমে সংযোজন : যে কসমোপলিট্যান সমাজ বা সংস্কৃতির কথা গৌরকিশোর ঘোষ বলেছেন, উনিশ শতকে সূচিত বহুনিন্দিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস কিন্তু সেই সংস্কৃতির পতাকাই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ সংস্কৃতির প্রধান দিকপালদের চিন্তাচেতনার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যাবে এঁরা বিশ্ব মানবিক ভাবধারা, যার আত্মা সমন্বিত সংস্কৃতি, তারই প্রবক্তা ছিলেন। রামমোহন ফরাসী বিদেশ মন্ত্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches'. ডিরোজিওর কবিতাগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, সেখানে রয়েছে গ্রীস, ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলন্ড, মধ্যপ্রাচ্য, শ্রীলংকা, হাফিজ, মক্কা, বৈদিক স্তোত্র : সব মিলিয়ে এক সহৃত পৃথিবীর ছবি। ইয়ং বেঙ্গলরা মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন বঙ্গভূমির সীমাবদ্ধ মানচিত্র। অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করতেন 'এক এক অসীমপ্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক এক পত্ররূপ ; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর স্বরূপ এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসীদ্বারা লিখিত যৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতিপ্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থপ্রতীতি করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্যালোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জনের অন্য কোন উপায় নাই, যথার্থ ধর্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই।' বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য-সূচি সংস্কারে ইউরোপীয় দর্শন পড়ানোর কথা বলেছিলেন। মাইকেল একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যদি ভাষা শুদ্ধ, ভাববোধ হৃদয়গ্রাহী ও বক্তব্য মানবিক হয়, তবে তার বিজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও মানে হয় না। তুমি কি মুরের কাব্য পছন্দ কর তার গ্রাচ্যত্বের জন্য অথবা কার্লাইলের গদ্য তার জার্মানত্বের জন্য?' তিনি যে কসমোপলিট্যান চরিত্রের সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপকার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক কার্যকারণের ফেরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় জাতীয়তাবাদের উত্থান। নবগোপাল মিত্র আখ্যা পান ন্যাশনাল মিত্র। কসমোপলিট্যান সংস্কৃতির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা শুরু হয়। এবং বলতে গেলে কসমোপলিট্যান সংস্কৃতির জোরালো বিকল্প হিসাবে এই ভাবধারা উঠে আসে। স্বদেশ ও স্বধর্মকে একাকার করে বঙ্কিম লেখেন তাঁর অধিকাংশ মননশীল ও সৃজনশীল রচনাগুলি। তাঁর 'বন্দেমাতরম' — এ স্বদেশমাতৃকা দেখা দেন হিন্দুপুজা দুর্গা প্রতিমার ইমেজে। আর 'আনন্দমঠে' একটি চরিত্র বলে ওঠে 'মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার'। রবীন্দ্রনাথকে কী মানস-সংগ্রামটাই না করতে হয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই মৃঢ়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। জাতীয়তবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আশ্চর্য টানাপোড়েন দিয়ে বোনা তাঁর স্বদেশ ও বিশ্ব দর্শন। জাতীয়তাবাদকে 'ভৌগোলিক অপদেবতা' নামে চিহ্নিত করে 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে মানব সভ্যতার এই গৌরবময় দানবকে তিনি নস্যাৎ করে গেছেন। অপরপক্ষে 'ভারততীর্থ' কবিতায় বা 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে গেছেন মিলনধর্মী বৈশ্বিক সংস্কৃতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ধারাটিকে। "আমরা যে দেশের সন্তান হই না কেন....মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাঁথতে হবে।" বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ভারতীয় হিসাবে এ আমাদের এক বড় পাওয়া। 'রেনেসাঁস' কথাটা বলছি এই জন্য যে জাতীয়তাবাদ নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদই রেনেসাঁসের প্রধান চরিত্র। বিশ্ববিখ্যাত

ইতালীয় রেনেসাঁসের সংস্কৃতি কদাচ স্বাদেশিক ছিল না, ছিল কসমোপলিটান। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে মানব সভ্যতা আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছিল সাংস্কৃতিকভাবে নিজেকে সম্প্রসারিত করে নিয়ে। বিখ্যাত রেনেসাঁস হিউম্যানিস্ট (প্রিন্স অব হিউম্যানিটিস নামে খ্যাত) এরাজমুস যথার্থই বৈশ্বিক মানুষ। তাঁর জন্ম নেদারল্যান্ডে, পড়াশুনা ফ্রান্সে, শিক্ষকতা ইংলন্ডে, ভ্রমণতীর্থ ইতালিতে, বনবাস প্রধানত বাসেলে, কথা বলতেন ভালবাসতেন প্রাচীন জার্মানে, ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক সংস্করণ প্রকাশ করেন, লাতিন ছিল তাঁর মাতৃভাষার মত। তিনি বলতেন, 'যেখানে ভাল গ্রন্থাগার আছে সেখানেই বিদ্বান ব্যক্তির স্বদেশ'। তাঁর সম্পর্কে বলা হত 'he belonged to no nation'. ইনিই রেনেসাঁসের যথার্থ প্রতিভূ। তীব্র স্বধর্মপ্রীতি ও স্বাজাতবোধ প্রকৃত পক্ষে অ্যান্টি-রেনেসাঁস। এই অ্যান্টি-রেনেসাঁস স্লোগান প্রথম তোলেন একজন 'জার্মান হারকিউলিস' তাঁর নাম মার্টিন লুথার। রিফর্মেশন নামধেয় ধর্মীয় শুদ্ধতাবাদের নেতা হিসাবে বিখ্যাত হলেও সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচনা করেছিল এক ধরনের উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদ। তাঁর 'অ্যাড্রেস টু দা জার্মান নোবেলটিজ' জাতীয় বহু প্রজন্মকেই পাওয়া যাবে জার্মান জাতীয়তাবাদের আগ্নেয় প্রভাবন। সিকিঙ্গেন, হুটেন প্রমুখ জার্মান জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মেলানো ছিল তাঁর হাত। তাঁদের 'ট্রিনিটি' কেমন ছিল? হুটেন লিখেছিলেন, 'Three ils I pray for Rome: Pestilence, famine and war. This be my Trinity'. লুথারও তীব্র রোম বিদ্বেষ পোষণ করতেন। ধর্ম ও দেশপ্রীতিকে একাকার করে লুথার যে আধুনিক দানবের জন্ম দিয়েছিলেন হিটলারের মধ্যে তা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। লুথারের জার্মান জাতিত্ববাদ শুধু রোমের বিরুদ্ধে নয়, ১৫৪৩ সালে রচিত তাঁর 'এগেইনস্ট দা জিউস' নামক প্রস্তাবটি করলে দেখা যাবে তার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিটলারের ভারি বুটের আওয়াজ। হঠাৎ একটি গুজব রটে যায় একজন ইহুদিকে নিয়োগ করা হয়েছে লুথারকে হত্যা করার জন্য। যদিও সে গুজবের সত্যতা কখনও প্রমাণিত হয়নি। তার প্রতিক্রিয়ায় লুথার লেখেন কুৎসিত এই ইহুদী-বিদ্বেষী প্রস্তাব। 'সমস্ত ইহুদীকে প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যেতে হবে। অন্যথা সুদের কারবার, বাণিজ্যাদি সহ সমস্ত রকম জীবিকা ছেড়ে তাদের ফিরে যেতে হবে কৃষিকার্যে। তাদের যা কিছু বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে। এমনকি কেড়ে নেওয়া হবে বাইবেল।' এই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আসল স্বরূপ। আমাদের রেনেসাঁস ভাষ্যকারদের অধিকাংশই রেনেসাঁসের কসমোপলিটান সংস্কৃতি যা তার মূল চরিত্র, সেটা বোঝেন নি। তাঁরা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে গেছেন। জাতীয়তাবাদের ল্যাকটোমিটার ডুবিয়ে বিচার করতে গেছেন রেনেসাঁসের খাঁটিত্ব-অখাঁটিত্ব। বুঝে, না-বুঝে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এই কসমোপলিটান চরিত্রটিকে নানাভাবে আঘাত করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের রামমোহন বিচার ('অন্য রামমোহন রায়') ও মোহিতলাল মজুমদারের রবীন্দ্র বিচারের ('বাংলার নবযুগ') আয়নায় ধরা পড়ে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী বিচারকের হিংস্র, আঘাতপ্রবৃত্ত মুখের বিকার। গৌরকিশোর ঘোষের লেখাটি পড়ে ভাল লাগল এইজন্য যে খুব সংকটের সময় দেরিতে হলেও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে লালিত মানববিভিক্ত ও সমন্বয়বাদী কসমোপলিটান সংস্কৃতির অতি সমৃদ্ধ কিন্তু অধুনা উপেক্ষিত ঐতিহ্যটি তিনি তুলে আনতে চেয়েছেন। বাংলার বিদগ্ধজনেরা অবশ্যই বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

এবারে আসব একটি পাল্টা প্রশ্নে। কখন আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলছি? যখন বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার মুখপাত্র আই. এম. এফ. — এর প্রতিনিধিরা ভারতীয় সংসদ অফিসের পাশেই বসে আছেন। আমাদের সৃজনশীল গবেষণা ও উৎপাদিনী সংস্থার মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের হিংস্র চিল। উপনিবেশবাদের ভিতরে বসে বিশ্বমানবতাবাদী সংস্কৃতির যে গৌরবময় বিকাশ বঙ্গ সংস্কৃতিতে হয়েছিল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় তা আমরা দেখি। এমন একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হাতের কাছে থাকতেও গৌরকিশোর ঘোষ তিনি তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করলেন না। তাঁর 'কসমোপলিট্যান সমাজ' ও সংস্কৃতির মডেলটা আই.এম.এফ.-ওয়ালাদের থেকে কতটা স্বতন্ত্র তা না বুঝে কসমোপলিট্যানের দিকে হাত বাড়ানো যায় কি?

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
টিচার ফেলো ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বি. জে.. পি. বেড়ে ওঠার জন্য যারা দায়ী তাদের সমালোচনা নেই কেন?

চতুরঙ্গ পত্রের নিয়মিত পাঠক আমি। ১৯৯৩-র মার্চ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের '১৪০০' সালের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামের কবিতাটি স্মরণীয় পুনর্মুদ্রণ। বিদ্যাসাগর মশাই-এর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে

অনুপুঙ্খ আলোচনাটি মনোজ্ঞ এবং এ বিষয়ে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর মশাইর ধারণার ও মনোভাবের বিশ্লেষণ পাঠকের পরম প্রাপ্তি। একই বিষয়ে ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন ইতিপূর্বে। তবু এ আলোচনাটি তাৎপর্যবাহী। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের উপর লেখাটি বেশ ভাল।

গত ৩।৪টি সংখ্যায় আপনারা নানা লেখায় এক — তরফাভাবে বি.জে.পি. কে অপরাধী ও দেশের পক্ষে অশুভ শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করে চলেছেন। এ বঙ্গের 'বাজারী পত্রিকাগুলো'ও কম ঘেউ ঘেউ করল না। গৌরকিশোর ঘোষ ঐ সব পত্রিকার পর এ পত্রিকায়ও বি.জে.পি-র শ্রাদ্ধ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু বি.জে.পি-র বেড়ে ওঠার জন্য যারা দায়ী সেই কংগ্রেস বা বাম দলগুলির সমালোচনা তাঁর কলমে নেই কেন? কারা দেশের বুকে এই রকম সমস্যা সৃষ্টি করল, কারা সেই সমস্যাকে জিইয়ে রেখে ফয়দা লুটতে চেয়েছে? বি.জে.পি. বরং একটা সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়েছে। এ রাজ্যে ভোটের আগে বারবার কেন মুসলমানদের বন্ধু সেজে ভণ্ডামি করা হয়? এসব কথা গৌরকিশোরের ঘোষের লেখায় নেই কেন? একই দেশের সব নাগরিকের জন্য একই আইন কেন হবে না— এই প্রশ্ন তোলাটা কি অপরাধ!

গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ হিন্দু, সাধারণ মুসলমান পাশাপাশি যুগ যুগ কেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাস করে আসছেন। তাদের মধ্যে কোন প্রীতির হানি ঘটেনি। এবারও ৬ই ডিসেম্বরের পর গ্রামবাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে চিড় ধরেনি। যেখানে ধাপ্পাবাজ রাজনীতিকরা আর সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী নামধারীরা নাক গলিয়েছে, সেখানেই গোলমাল বেধেছে। এরা সব কাণ্ডজ্ঞে বিবৃতি ও ভণ্ড দেশপ্রেমের নামাবলী গায়ে দিয়ে বাজার গরম ও শান্ত মনকে অশান্ত করে দিতে চায়। পান্নালাল দাশগুপ্ত মশাই বলেছিলেন, এই সব বাজারী পত্রিকা আর ভণ্ড রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের দূরে হটিয়ে দিতে পারলে দেশে নতুন করে কিছু শুরু হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা, হানাহানি, মনের বিদ্বেষ এরাই জন্মিয়ে দেয়। এরা হাতেনাতে প্রত্যক্ষভাবে সামান্যতম সমাজসেবা বা মানুষের কল্যাণে লাগে না, অথচ বিবৃতি, বড় বড় কথায় দড়— যা মানুষের শুভ বোধকে অশুভ পথে ঠেলে দেয়। গৌরকিশোর ঘোষের লেখা পড়ে একটা ঘৃণাই জেগে ওঠে। কিসের Re-action — এ সংঘ পরিবার এত বেড়ে উঠল, কেন দেশের বহু লোকের মানসিক সায়ুজ্য এদের প্রতি, — তা গৌরকিশোর ঘোষের মতো বুদ্ধিজীবীদের অজানা?

সুবিমল দত্ত, কাঁথি, মেদিনীপুর

মৌলবাদ এবং ধর্ম

'সত্যপালন বনাম জনতা তোষণ : কিছু প্রশ্ন কিছু তথ্য' নামক চিন্তায় সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত মহাশয় ও 'চতুরঙ্গ' (জানুয়ারি, ১৯৯৩) সংখ্যায় তা প্রকাশ করার জন্য মাননীয় সম্পাদক মহাশয় — উভয়কেই থাকল প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বাস্তবকে সঠিকভাবে চিত্রিত করার প্রবণতা একালের পেশাদার শহুরে বুদ্ধিজীবি মহলে নেই বললেই চলে, তাই আজ প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় 'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদী' শব্দ যত্রতত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। মৌলবাদ কী— তা সুস্পষ্টভাবে না জানলে মৌলবাদী কারা তা যেমন নিশ্চিত করে বলা যায় না, তেমনি মৌলবাদ ও ধার্মিকতার মধ্যে পার্থক্য না করতে পারলে ভারতের মত ধার্মিক দেশে বিশৃঙ্খলারই সম্ভাবনা। যাকে তাকে, মোল্লা, মৌলভী বা সাধন-ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমকে অথবা পণ্ডিত, পুরোহিত বা সাধারণ আচারনিষ্ঠ হিন্দুকে অথবা ধার্মিক খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখকে মৌলবাদী বলে, ভারতের এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে যে অযথা ঋণাত্মক অর্থে নিকৃষ্ট মনে করা হবে — সে সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই বেহুঁশ।

অনেকের মতে — মৌলবাদ হল সে তত্ত্ব, যেখানে মূল বা (Fundamental) কোন প্রাচীন ধারণার অবিকৃত রূপকে অপরিবর্তনীয় মনে করে, সংস্কার সমালোচনার উর্দ্ধে ধরে নিয়ে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এবং সময়ক্ষেত্রে ঐ মতের বিরোধী কণ্ঠস্বর রোধসহ দৈহিক নিপীড়ন। এ ব্যাপারে মনে রাখা দরকার অনেকে এমনও আছেন যারা ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন মতবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং ঐ মতবাদের বিরোধিতাও স্বীকার করেন না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় — সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পরও পৃথিবীব্যাপী এখনও অসংখ্য মার্কস ও লেনিনবাদী ব্যক্তি আছেন, যারা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে অপরিবর্তনীয় ও চরম সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁদের এ যুক্তিতে মৌলবাদী বলা হল না এবং মৌলবাদ শব্দটাকে কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে লটকে দেওয়া হল।

আমাদের জাতীয় পত্রপত্রিকায় মৌলবাদ সম্পর্কে কিরূপ বিকৃত ধারণা পোষণ করে তার দু-একটা উদাহরণ দিতে চাই। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্বন্ধে একটি বামপন্থী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত [২৮শে নভেম্বর ১৯৯০] নিবন্ধের সঙ্গে দাড়ি ও টুপি-সমন্বিত পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের ছবি ছেপে চিত্র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে, 'গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক মৌলবাদ', : পাঠককে ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ইসলাম মেনে চললে এবং সে অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ পরলে সে নির্ঘাত মৌলবাদী। আবার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত [২৫শে এপ্রিল ১৯৮৭] 'ইসলাম: মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ' নামক নিবন্ধে একটি ছবি মুদ্রিত করা হয়েছে। ছবি থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায় — ছবিটির ব্যক্তিটি কোনও মাজারের মস্তান বাবা বা মুশকিল-আসান জাতীয় ফকিরের। তার পরনে নানা রঙের আলখাল্লা, গলায় — রং বেরং-এর কাঁচ ও পাথরের দুতিনটি মালা, অকর্তিত দীর্ঘচুল ও গোঁফ, গ্রামে এধরনের বহু ফকিরকে দেখেছি যাদের হাতে একটা ঝাণ্ডা থাকে যা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় বুলিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। অথচ ও কিম্ভূতকিমাকার ছবিটির নিচে চিত্র পরিচিতিতে লেখা হল — 'মৌলবাদী উলামা'। বস্তুত উলেমা বলতে বোঝায় ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানী, পণ্ডিত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। এককথায় নিখাদ ধর্মীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিহিত ধর্মীয় আচরণকারী ব্যক্তি মাত্রেই মৌলবাদী এরকম একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে 'ইসলাম'— ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা মনে করে না, তাছাড়া ইসলামীয় মতবাদে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রণালীর বহু উপকরণ বিদ্যমান থাকায় ইসলামীয় মতবাদে দেশগঠন একেবারে অসম্ভব যে নয় — সেকথাও আমাদের অনেকের অজানা। জানা থাকলেও ধর্মীয় গন্ধ থাকার কারণে আমরা নাক সিঁটকাই। ইসলামী রাষ্ট্র গঠন যুক্তিসংগত কিনা — তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও স্মরণে রাখা দরকার হজরত মহম্মদ (সঃ) ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধনে 'মদীনা'য় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন — যাকে বর্তমানের ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তারা আদর্শ (Model) মনে করে। এবিষয়ে বিখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রদ্ধেয় অম্লান দত্ত মহাশয় তাঁর 'ধর্ম ও যুক্তি' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে — মদীনায় যে শাসনপ্রণালী হজরত মহম্মদ (সঃ) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। আমার কথা — ইসলামপন্থীরা ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা করলে তা যদি মৌলবাদ হিসাবে নিন্দিত হতে পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গঠিত রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা মৌলবাদ নয় কেন ? ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নিতান্তই ভাববাদী দর্শন ও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে না করে, এক মতবাদ-এক আদর্শ হিসাবে দেখলে ব্যাপারটা যথার্থতা লাভ করে। ত্রুটি বা সমালোচনা সবক্ষেত্রেই সম্ভব, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কোন প্রচেষ্টা নিন্দনীয় হলে অন্যক্ষেত্রে তা যদি নিন্দনীয় না হয় তাহলে সেটা আধুনিক মনের পরিচয় বহন করে না, বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যও নয়।

তাই সুস্থ সমাজের প্রয়োজনে মৌলবাদ নিয়ে বাস্তববাদী আলোচনা করা একান্ত দরকার। অযথা ধার্মিক ব্যক্তিদের হয়রানি করা, ধর্মকে মৌলবাদের সমগোত্রীয় মনে করা, যত দাঙ্গা, সন্ত্রাস, অন্যায়, অত্যাচারের মূলহিসাবে ধর্মীয় মৌলবাদকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস অত্যন্ত অযৌক্তিক ও বেদনার। হিটলারের ইহুদী নিধন, স্তালিনের তথাকথিত বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের হত্যা, কম্বোডিয়ায় খমের রুজ দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু-তে ধর্মীয় মৌলবাদ না থাকলেও তাঁদের স্বঘোষিত নিজ নিজ মৌলবাদ যে ছিল তা বলাবাহুল্য। আমার মতে ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার যেমন সংবিধান স্বীকৃত তেমনি নাস্তিকের বেঁচে থাকার অধিকার। প্রকৃত ধার্মিক ও অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত ধার্মিক ব্যক্তিদের চিহ্নিত না করতে পারলে আমাদের এই বহুধর্মাবলম্বীর দেশে সমাজে শান্তিতে বাস করাই মুশকিল। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'মৌলবাদ' সম্পর্কিত সংজ্ঞাও বোধহয় সমগ্র ভারতের মধ্যে এক নতুন পথের দিশারী।

শেখ একরামূল হক
১৭, বেডফোর্ড লেন, কলি-১৬

'ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা'

আপনার পত্রিকায় আমার পত্রখানি প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

'চতুরঙ্গ' (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩) শ্রী দেবদাস জোয়ারদার লিখিত পত্রের উত্তরে কয়েকটি কথা লিখছি। তিনি লিখেছেন : "অধ্যাপক দের মতানুসারে বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদের প্রতিক্রিয়াতে ভারতে হিন্দু মৌলবাদ শক্তি পাচ্ছে এ ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।" পরে পত্রের আর এক অংশে শ্রী জোয়ারদার একই কথার পুনরুক্তি করে মন্তব্য করেন : "পক্ষান্তরে অধ্যাপক দে যেন বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের হিন্দু মৌলবাদের সাফাই গেয়েছেন"।

কিন্তু প্রশ্ন হল : আমার গ্রন্থের কোথায় আমি এই সব মন্তব্য করেছি ? তাঁর পত্র পড়ে আমার মনে হয়েছে, তিনি এখনও আমার গ্রন্থ 'ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা' (জানুয়ারি, ১৯৯২) পড়েননি। তাই সবিনয়ে বলতে চাই, আমার গ্রন্থ পড়ে যদি শ্রী জোয়ারদার তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন তাহলে খুবই উপকৃত হতাম।

অমলেন্দু দে

পত্রলেখকের জবাব

কখনও ভাবিনি অধ্যাপক ড. অমলেন্দু দে মহাশয়ের সঙ্গে পত্রযুদ্ধে নামতে হবে। আমি তাঁর 'ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা' বইটি প্রথম চিঠি লেখার আগে পড়িনি এই অভিযোগ খণ্ডন নিঃসন্দেহে আমার দিক থেকে অস্বস্তিকর। তবুও এই অস্বস্তিকর কাজ করতে হচ্ছে বলে আমি তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার যে চিঠি প'ড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে আমি তাঁর বইটি পড়িনি, সেই চিঠিতে অভিযোগ করেছিলাম যে মূল প্রথম অধ্যায়ের সূত্রনির্দেশে প্রদত্ত মূল্যবান উদ্ধৃতিগুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম সম্পর্কে সমালোচক শ্রী শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন নি। সূত্রনির্দেশগুলি না পড়লে এমন মন্তব্য করা সম্ভব হত না। সত্যি কথা বলতে কি, পাদটীকার আকারে এই সূত্রনির্দেশগুলিই বইটির অমূল্য অংশ।

মানুষে মানুষে বোঝার পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেজন্য বই না পড়ে চিঠি লেখার অভিযোগটি আমার কাছে নির্মম মনে হচ্ছে। তবে আমার পক্ষ থেকে এ কথা স্বীকার করছি 'বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের হিন্দু মৌলবাদের সাফাই' গাওয়ার অভিযোগটিতে আমি শব্দ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করেছিলাম। সাফাই তিনি গান নি, তবে দুই দেশের মৌলবাদের যোগ বিষয়ে তিনি বইটির ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে এখানকার সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্বরূপ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের যেমন 'এপিসেন্ট্রাম' (Epicentrum) বা উৎপত্তিস্থল থাকে, তেমনি এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটি উৎসমুখও বাংলাদেশ রাষ্ট্র।' উদ্ধৃত বাক্যটি সত্য। কিন্তু ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা অনায়াসে এর কদর্থ করতে পারেন — এই আশঙ্কা থেকেই শব্দ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি এসে গিয়েছিল।

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রূপে দাঙ্গার যৌক্তিকতা বারবার প্রমাণ করতে বসেন, আর তাতে রাজনীতির ব্যবসা জমে; কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়। দিনকাল বড্ড খারাপ। তা না হলে সারাজীবন যিনি সম্প্রীতি ও সংহতির সাধনা ও সন্ধান করেছেন, সেই অধ্যাপক দে মহাশয়ের রচনা মৌলবাদীদের অস্ত্র জোগাতে পারে এমন কথা বলার সাহস পাই ?

মৌলবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ ক'রে আজ পৃথিবীব্যাপী এক সংকট সৃষ্টি করছে। তাই ভারতের মৌলবাদের আলোচনার [illegible]না ভারতীয় উপমহাদেশের পটভূমিতে আলোকপাতই যথেষ্ট [illegible] সারা পৃথিবীর সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে তার আলোচনা চাই। [illegible] বইটিতে সে আলোচনা নেই। জানুয়ারির শেষে প্রেরিত ও '[illegible]'র ফেব্রুয়ারি '৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার চিঠিটির পরে [illegible]র্ক-বম্বে-কলকাতা-লন্ডনের বিস্ফোরণ, ইতালিতে মন্ত্রী [illegible]র যোগসাজস, মুসলমান বসনিয়ানদের উপর খ্রিস্টান সার্বি[illegible] নৃশংস অত্যাচার, জোহান্সবার্গ কলম্বোতে সন্ত্রাস[illegible]দের নতুন নতুন আক্রমণ হয়ে গেছে।

[illegible] পৃথিবী জুড়ে দুর্বলের উপর নির্যাতন, মৌলবাদ ও সন্ত্রা[illegible] অপ্রতিহত বিস্তার, বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের বাজার, কা[illegible], মাস্তানির বড় বাজার এসব অশুভের মধ্য দিয়ে আজ মা[illegible] সুচেতনা তিমিরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই আন্তর্জাতিক [illegible] ভারতীয় রূপের বিভীষিকা নিয়ে অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু [illegible] তাঁর সমানধর্মারা আরও আলোচনা করুন।

দেবদাস জোয়ারদার
বারাসত সরকারি কলেজ

প্রসঙ্গ মৌলানা আজাদ

মাঘ (১৩৯৯) সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত রচিত 'জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদ' পড়ার পর কিছু কথা মনে পড়ল।

অধ্যাপক রক্ষিত লিখেছেন, "অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হননি সমকালীন রাজনীতির জটিলতার জন্য সেই ক্ষোভ তাঁর ছিল আমৃত্যু" — একথা সর্বাংশে সত্য নয়। সমকালীন লেখকদের বর্ণনানুসারে মনে হয় যে সমস্ত গুণ সত্ত্বেও মৌলানা আজাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ছিল এবং কংগ্রেসেও তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ গান্ধী বা নেহেরুর মতন সমকালীন ঘটনাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ রাজকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "He [Azad] is a gentleman and stood for good sense and moderation as far as he was able, inspite of poor health and a naturally weak character" (জুলাই ৮,১৯৪৬ এ চিঠি, Viceroy's Journal-এ উদ্ধৃত)।

সাংবাদিক দুর্গাদাস একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আজাদ মদ্যপান করেন কিনা — গান্ধীজির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মৌলানা সাহেব দেরি করেছিলেন, সে যাত্রায় নেহেরু আজাদ কে উদ্ধার করেছিলেন। এ সব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মৌলানা আজাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ছিল। গান্ধীজির মুখের ওপর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমস্যা সমাধান না করতে পারার জন্য তিনিও দায়ী।

আজাদ মনে করতেন হিন্দু-মুসলমান বিভেদের কারণ: "প্রথমত, ইংরেজ সরকার এই বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং তা জিইয়ে রেখেছে। আর, দ্বিতীয় কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা তাতে ইন্ধন দিয়েছেন।" মৌলানা সাহেব এই সিদ্ধান্ত অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস খুবই জটিল, এক-দু কথায় এর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, তবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য যে এই বিভেদকে জোরদার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব ছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলমানদের ভয়ের কারণ ছিল। মৌলানা সাহেব এসব বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেনি। শুধু ভাববিলাসের তাড়নায় ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অধ্যাপক রক্ষিতও বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন।

আমাদের মনে রাখা দরকার খিলাফৎ আন্দোলনে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ ভবিষ্যত ভারতের পক্ষে শুভ হয় নি। আজাদের জামা মসজিদের ভাষণ (১৯৪৮) সত্য ঠিকই কিন্তু অধ্যাপক রক্ষিত যে দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার করেছেন সেটা ঠিক নয়। মুসলমানরা 'misguided leadership'-র শিকার হয়েছিলেন মেনে নিয়েও বলা যায় যে কংগ্রেস মুসলমানদের misguide করেছিল। কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা এবং মানসিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মৌলানা আজাদও এ ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির বা বাস্তব বোধের পরিচয় দিতে পারেননি। আমার মনে হয় জিন্নার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল তিনি মুসলমানদের মানসিকতা বুঝতে পেরেছিলেন।

১৯৪০ সালের ৮ অগস্ট আজাদকে লেখা জিন্নার এক পত্রাংশ অধ্যাপক রক্ষিত উদ্ধৃত করেছেন যেখানে জিন্না আজাদকে 'showboy' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ঐ প্রবন্ধের অন্য জায়গায় অধ্যাপক রক্ষিত P. Mehra- র মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে জিন্না কিভাবে আজাদকে অপমান করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক রক্ষিতের উচিত ছিল 'showboy' বলার প্রকৃত কারণ কি ছিল সেটা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। রামগড়ে আজাদের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসের কাছ থেকে জিন্না স্বীকৃতি চাইছিলেন যে কংগ্রেস যেন জিন্নাকে মুসলমানদের **sole spokesman** হিসাবে মেনে নেয়। কংগ্রেস জিন্নার দাবি নস্যাৎ করে এবং মৌলানা আজাদকে সভাপতিরূপে বরণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে জিন্নার দাবী কত হাস্যকর এবং সেটাই ছিল জিন্নার রাগের আসল কারণ যার ফলে চিঠিতে তিনি আজাদকে congress showboy রূপে উল্লেখ করেছিলেন। সমকালীন সাংবাদিক দুর্গাদাসের বই থেকে জানা যায়, "But Jinnah was still a nationalist at heart. He tried to cash in on his new status and made another effort in January 1940 to persuade the congress to accept him as the **sole spokesman** of the Muslims. 'That is all I seek' he told me.

....."He took further offence when the Congress elected Azad as its President in March 1940 at Ramgarh to demonstrate to the world that Jinnah was not the **sole spokesman** of the Muslims. 'They have now added insult to injury by selecting that showboy, he bitterly remarked. 'No Durga, if only Gandhi would join hands with me, the British game of divide and rule would be frustrated." (Durga Das, India from Curzon to Nehru and After P.194) পশ্চাদ্‌দৃষ্টিতে দেখলে আজ মনে হয় যে কংগ্রেস বহুবার আজাদকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার প্রসঙ্গে অধ্যাপক রক্ষিত লিখেছেন,

"অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলি কংগ্রেসী-মন্ত্রীদের দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দই করতে চাইলেন না" — যার ফলে লিগ কংগ্রেসের মিলনসেতু রচিত হতে পারিনি। পাঠকদের মনে হতে পারে এর জন্য লিয়াকৎ আলি তথা লিগ নেতাগণ দায়ী ছিলেন। ঘটনা ছিল আরও জটিল। অন্তর্বর্তী সরকারে জিন্না চেয়েছিলেন দেশরক্ষা দপ্তর, ওয়াভেল দিতে চেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর। কংগ্রেস নেতাদের জেদের জন্য এই দুটো দপ্তরের কোনটাই লিগকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। লিগকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অর্থদপ্তর দেওয়া হয়েছিল। দুর্গাদাস জানাচ্ছেন যে, "Rafi A. Kidwai, for the Congress suggested that Finance be yielded to the League instead. No League representative, he told me, would have the competence to deal with Finance and failure would bring the League bad odour." (দুর্গাদাস, ঐ পৃ. ২৫২) প্রথম থেকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল লিগকে বেইজ্জত করা এবং লিয়াকত আলি যদি কংগ্রেসের নিজের চালেই কংগ্রেসকে ঘায়েল করে থাকেন তাহলে তাঁকে সব দোষ দেওয়া যায় না। লিগ ও কংগ্রেস কেউই সত্যিকারের সমঝোতা চায়নি, সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার দায়িত্ব উভয়েরই।

মৌলানা আজাদের ধারণা ছিল যে গান্ধীজি জিন্নাকে 'কায়েদে আজম' সম্বোধন করে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়েছিলেন যার ফলে জিন্না গান্ধীজির সমকক্ষতা দাবী করতে শুরু করেন। মৌলানার এই ধারণা ভুল। ডিসেম্বর ২, ১৯৩৯-এ বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো গান্ধী, জিন্না এবং Chancellor of Princes দের সঙ্গে আলোচনা করে প্রমাণ করেছিলেন যে জিন্নাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ১৯৪০ সালের ৮ অগস্ট এক ঘোষণায় বড়লাট জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার এমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে না যাতে ভারতীয় জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের আপত্তি আছে। ১৯৩৯ সালে বড়লাট জিন্নাকে গান্ধীজির সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জিন্না 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এসব গান্ধীজির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। গান্ধী নয় ব্রিটিশ সরকারই জিন্নার গুরুত্ব বাড়িয়েছিলেন।

অধ্যাপক রক্ষিত লিখেছেন, "আজাদের মতে, বড়লাটের কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ করেছেন প্যাটেল এবং তারপরে নেহেরু"। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে মৌলানা আজাদের এ ধারণাও ভুল। দেশভাগে গান্ধীজির ভূমিকা নগণ্য ছিল না। এ বিষয় শ্রদ্ধেয় নীরেন ঘোষ তথ্যসহ প্রচলিত- ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। ১৯৪২ সালেই জি. ডি. বিড়লা গান্ধীজিকে লেখা এক চিঠিতে ভারতভাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং গান্ধীজিও ঐ প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালেই নেহেরু ও প্যাটেল স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে জানিয়েছিলেন যে 'পাকিস্তানের ধারণাকে বাতিল করে দিতে তাদের ইচ্ছে নেই'। ১৯৪২ সালেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিয়েছিল যে, 'দেশের কোন অঞ্চলকে তাদের প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ভারত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রাখার ইচ্ছে নেই'।

১৯৪০ সালের লাহোর তথা পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হওয়ার পরই গান্ধীজি লিখেছিলেন, 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতেই হবে, যা বাকি ভারতের আছে। আমরা বর্তমানে একটা যৌথ পরিবার, যে কোন মেম্বার একটা ভাগ দাবী করতে পারে।' ১৯৪৬ সালের মার্চ ১৫ তারিখে ওয়াভেল পেথিক লরেন্সকে জানিয়েছিলেন যে, "প্রসঙ্গক্রমে গান্ধী কথাবার্তায় আবেলকে বলেছেন, জিন্না নিশ্চয়ই সত্যিকার মুসলিম এলাকাগুলি পেতে পারেন তার পাকিস্তানের জন্য!" কেবল গান্ধীজি নয় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও জিন্নার দাবিকে মেনে নিতে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। নেহেরুকে লেখা রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিঠির ভিত্তিতে R.J. Moore সিদ্ধান্ত করেছেন যে নভেম্বর ১৯৩৯ সালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ চাননি যে জিন্না ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন সমঝোতা হোক। ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেতারা দেশ ভাগ করেও ক্ষমতা পেতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেজন্য ১৯৪৭ সালের মার্চে নেহেরু-প্যাটেল-প্রসাদ জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন যখন তাঁরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে ভাগ করার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এসব কারণেই নীরেন ঘোষ মন্তব্য করেছেন ".... ভারত বিভক্তির জন্য গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেলের দায়িত্ব জিন্নার চেয়ে কম ছিল না। হয়ত বেশী ছিল" (নীরেন ঘোষ, দেশ বিভাগ ও নানা প্রসঙ্গ পৃঃ ৯-১৪ দ্রষ্টব্য)।

সব শেষে একথা জানাতে চাই যে অধ্যাপক নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের প্রবন্ধ পড়ে এই ধারণা হয় যে ক্ষমতা হস্তান্তর নাটকে জিন্না ছিলেন 'খলনায়ক'। এই প্রচলিত ধারণা বর্তমানে যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। মৌলানা আজাদ মুসলমানদের মানসিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দেশভাগ নয় ক্ষমতা দখল করাই ছিল জিন্নার উদ্দেশ্য। কংগ্রেস নেতাদের লক্ষ্যও ছিল তাই। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার নগণ্য অংশ ছিল মুসলমান জনগণ। ইংরেজমুক্ত

ভারতবর্ষে ক্ষমতা কারা ভোগ করবে এই চিন্তাই মুসলমান নেতাদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে জিন্না পর্যন্ত সব মুসলমান নেতারাই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে ভীত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে কখনই ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভব ছিলনা। সমস্যা সমাধানের উপায় ছিল দুটো—
১. অখন্ড ভারত কিন্তু দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ২. বিভক্ত ভারত এবং সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র। জিন্না চেয়েছিলেন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে, রাজ্যসরকারের ক্ষমতা থাকবে যথেষ্ট যার ফলে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে মুসলমানরাই ক্ষমতাভোগী হবে। মৌলানা আজাদের সঙ্গে জিন্নার দৃষ্টিভঙ্গির মিল এ বিষয়ে লক্ষণীয়। এপ্রিল ১৫, ১৯৪৬ তারিখের মৌলানা সাহেবের প্রস্তাব জিন্নার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না এমনকি মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবও জিন্না মেনে নিয়েছিলেন এই আশায় যে প্রদেশগুলো নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার লাভ করবে। পরবর্তী ঘটনা সকলের জানা। তবে যেটা কম জানা আছে সেটা হল যে কংগ্রেস কোনো সময়ই রাজ্যকে বেশি ক্ষমতা দিতে চায়নি। কংগ্রেসকে ভয় করার যথেষ্ট কারণও ছিল। মৌলানা আজাদ জিন্না তথা মুসলমানদের এই ভয়টা বুঝতে চাননি। রাজ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের পতন ঘটাতে পারে — স্বাধীনতার পর আমরা বহুবার দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার কেমনকরে রাজ্য সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এই ক্ষেত্রে মৌলানার চেয়ে জিন্না ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি। যুক্তিবাদী ব্যক্তির কাছে কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র সমর্থন যোগ্য ছিল না। জুন ১৯৪০ সালে সপ্রু বলেছিলেন, "The recent pronouncement of Mahatma that it was no use calling an all-parties conference, as other parties do not share the point of view of Congress, has filled me with despair." ওয়াভেলের ধারণা ছিল, "The real objective of the Congress, certainly of the Left wing extremists, is not, at present, so much to make constitution, as to obtain control and power at the centre. Their plan is to delay the formation of a constitution until they have obtained control at the centre, have succeeded getting British troops and British influence removed from the country, and have gained over the Indian Army and the Indian Police forces as their instrument. They then intend to deal with the Muslims and the Princes at their leisure" (Viceroy's Journal 30.5.46 পৃ. ৪৮৩)। ওয়াভেল প্যাটেলকে ফ্যাসিস্ট বলতেও দ্বিধা করেন নি। এরপরও কংগ্রেসের ওপর বিশ্বাস রাখা সম্ভব ছিল কিনা পাঠকসাধারণই বিচার করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকে গান্ধীকে নায়ক এবং জিন্নাকে খলনায়ক করা অর্থহীন। দুর্বল চরিত্রের মৌলানার পক্ষে ক্ষমতালোভী সহকর্মীদের প্রতিরোধ করা ছিল অসম্ভব—আধুনিক ভারতের ইতিহাসের এই হল ট্র্যাজেডি।

আলাউদ্দীন আহমদ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
তুফানগঞ্জ - ৭৩৬১৬০

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গ

ডিসেম্বর '৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত, সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ-লিখিত "ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে কিছুকথা" পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হলাম।

সরকারি অফিসের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দ, তাঁদের সম্পর্কে আইনজ্ঞ হবিবুল্লাহ সাহেবের উক্তি: "সরকারের কাছ থেকে হারামের পয়সা খেয়ে সমাজে এরা গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবেই বিরাজ করে।" আবার মাধ্যমিক স্কুলের পরিচালক সমিতি-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "চারজন শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এক দল হলে গুরুতর অপরাধী শিক্ষকও বেমালুম খালাস পেয়ে যান।" কিন্তু 'একদল' না হলে কী হয়, সে প্রশ্নটাই হবিবুল্লাহর মাথায় আসে নি। অথচ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে প্রায় সর্বত্র বাম সরকার শিক্ষকদের ঐক্য তথা শিক্ষার স্বার্থটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। আর গুরুতর অপরাধ ঘটানোর জন্যেই নাকি শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে চায় — এই যদি কোনও ভদ্রলোকের বিশ্বাস হয়ে থাকে, তবে ত 'শিক্ষক-দিবসে'র ভণ্ডামিটাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় করা উচিত এক্ষুনি! শিক্ষক সম্প্রদায়কে হেয়-অশ্রদ্ধেয় করে সমাজের কল্যাণকেই ধ্বংস করা হচ্ছে না কি? কার স্বার্থে? প্রকৃত দোষীর সাজা হোক না!

হবিবুল্লাহ সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'আদর্শ' ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতিবেশী একটি বাংলা মাধ্যমের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কয়েকটি তথ্য দিতে চাই, আমাদের স্কুলে

এগারোটি (শিক্ষক ৮+শিক্ষাকর্মী ৩) পদ শূন্য পড়ে আছে। তবু বেতন পাই অনিয়মিতভাবে, প্রায়শ কিস্তিতে; পি এফ যথাকালে জমা পড়ে না। ক্লাশে আলো, পাখার ব্যবস্থা হয় নি, গত চল্লিশ বছরেও। লাইব্রেরি-ল্যাভাটরির অবস্থাও করুণ। কমনরুম নেই, অথচ উচ্চ মাধ্যমিকের কলেজিক্লাশ যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলভাবেই চালাচ্ছি, প্রমোশন-যুক্ত কলেজ শিক্ষকদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার অর্ধেকমাত্র পেয়ে। জমি-বাড়ি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কারচুপির ফলে স্কুলে সাইনবোর্ড টাঙানোর উপায় পর্যন্ত নেই। স্বৈরাচারের শিকার এক বিশবছরের শিক্ষাকর্মী চাকরির নিরাপত্তার স্বার্থে মামলা লড়ছেন বছর দশেক ধরে, শিক্ষকদের সাহয্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলের উন্নয়ন-তহবিল রুগ্ন হচ্ছে।

মিত্র কমিশন কোথাও লার্নিং ইংলিশের বাংলা তর্জমা করার কথা বলেনি। বলেছে এতদসংক্রান্ত টীচার্স ম্যানুয়ালের তর্জমা করতে, বাংলা ইত্যাদি ভাষায়। কিন্তু বাংলামাধ্যম স্কুলে ইংরেজি-শিক্ষাটা পঙ্গু হয়েছে "ফাংশনাল-কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ" নামক অদ্ভুত পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ায়। এ পদ্ধতির কার্যকরতা প্রমাণে বিশ্বের কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রাজি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়াদেরই শুধু কেন ব্রিটিশ পরীক্ষাগারের গিনিপিগ হতে হয়েছে? বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত পর্যন্ত উপেক্ষিত কেন? প্রথাগত পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হয় যে-স্কুলে, রমরমা হবেই, কারণ এসমাজে ইংরেজি অপরিহার্য, আজও। তার কিন্তু এ-মাফিয়া ও সাট্টাবাজের সমাজ বীরত্বের সঙ্গে গাল পাড়ছে কেবল শিক্ষকদেরই, যাঁরা কেবল শিক্ষা নয়, সরকারি কোষাগারকেও 'ধ্বংস করছেন' মনে করে।

নির্মল সাহা, শিক্ষক
৩ মহামায়া লেন, কলকাতা-২৬

জাত বৈষ্ণবকথা : একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে

চতুরঙ্গ পত্রিকার তিপ্পান্ন বর্ষ সংখ্যা আট, ডিসেম্বর ১৯৯২- তে শ্রী অজিত দাস লিখিত জাত বৈষ্ণব কথা প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন, "কলকাতার সুবর্ণবণিক কোটিপতি মতিলাল শীল (১৭৯২ ১৮৫৪) ধর্মসভার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বৈষ্ণবদের দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করতে। লিখিত মুদ্রিত দাবীপত্রই পেশ করেছিলেন। সে দাবীপত্র আমি পড়িনি। ...... সুবর্ণবণিক সমাজের এই দাবী সম্পর্কে ভাবতে গেলে ঐতিহাসিক পটভূমির কথা মনে জাগে। সুবর্ণবণিক সমাজ আদিতে ছিলেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধ সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। তাই তাঁরা বল্লালী সমাজে প্রবেশ করেননি।"

মতিলাল শীলের ঐ দাবীপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সালে। তুলোটকাগজে পুঁথির আকারে দশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ঐ পুস্তিকার ১ - ৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতিলাল শীলের পত্র বিনিময় এবং তারপর বাকীটা ছিল বৈষ্ণব সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন ও ব্যবস্থাপত্র। মতিলাল শীলের ঐ পুস্তিকা ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তির প্রথম খন্ডে 'দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল' শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ পুস্তিকাটি হুবহু মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন। ঐ প্রবন্ধের কোথাও বা সুবর্ণবণিকদের উৎপত্তি সংক্রান্ত অন্য কোন স্থানে সুবর্ণবণিকরা যে বৌদ্ধ ছিলেন এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু এই মতই সঠিক বলে বিবেচিত যে সুবর্ণবণিকরা ছিলেন বৈশ্য হিন্দু। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত নিমাই চাঁদ শীলের 'সুবর্ণবণিক' নামক গ্রন্থ ও বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ' থেকে জানা যায় অযোধ্যার সমীপবর্তী রামগড় নামক স্থানে থাকতেন একদল বৈশ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ও অত্যাচার থেকে নিজেদের স্বকীয়তা বাঁচাতে ঐ বৈশ্য হিন্দুদের নেতা সনক আঢ্য ষোল ঘর প্রধান ও ত্রিশ ঘর অপ্রধান বণিকদের নিয়ে চলে আসেন বঙ্গদেশের তৎকালীন হিন্দু রাজা আদিশূরের রাজত্বে। রাজা আদিশূর তাঁদের বাস করতে দিয়েছিলেন ব্রহ্মপুত্রের তীরে। এই হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত বৈশ্য হিন্দুরা ছিলেন সুবর্ণ ব্যবসায়ে পারদর্শী তাই রাজা আদিশূর তাঁদেরকে সুবর্ণবণিক আখ্যা দিয়েছিলেন, আর যে গ্রামে তাঁরা বাস করতেন সেই গ্রামের নাম রেখেছিলেন সুবর্ণগ্রাম। কালে তা বিখ্যাত বন্দর হয়ে ছিল। সুতরাং সুবর্ণবণিককের উৎপত্তি বৈশ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী থেকেই, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থেকে নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নিত্যানন্দদেবের প্রিয় পার্ষদ বৈষ্ণব দর্শনের সুবাহুনামা পঞ্চম গোপাল সুবর্ণবণিক কূলোদ্ভব ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের বিশেষ যত্নে সুবর্ণবণিকেরা বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হয়। তার আগে রাজা বল্লাল সেনের চক্রান্তে এই হিন্দু বৈশ্য সম্প্রদায় জল-অচল পতিত অন্তজ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন, সে আর এক ইতিহাস।

শ্যামল দাস
৪৫, সৈহাট্টা রোড
পোঃ খাগড়া
মুর্শিদাবাদ